পাঠমালিকা

[১ম ভাগ]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

পাঠমালিকা

[১ম ভাগ]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

৭৭/২ পার্ক স্ট্রীট :: কলিকাতা-৭০০০১৬

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে, ১৯৬৩
তৃতীয় মুদ্রণ : জুন, ১৯৬৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৬৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৭৫
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৭৬
চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৭

মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

প্রকাশক :
শ্রীঅনিল চন্দ্র বিশ্বাস
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৬

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র
নালন্দা প্রেস
১৫৯-১৬০ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

মুনি আর ইঁদুরের গল্প

রাজশেখর বসু

এক মুনি বনে বাস করতেন। একদিন তিনি দেখলেন, কাগের মুখ থেকে একটি ইঁদুর-ছানা মাটিতে পড়ে গেছে। মুনি খুব দয়ালু ছিলেন, তিনি ইঁদুর-ছানাটিকে পুষতে লাগলেন। খুব খেতে পেয়ে ইঁদুর-ছানাটি মোটা হল। একদিন একটা বেড়াল তাকে ধরতে গেল, ইঁদুর তখনই মুনির কোলে গিয়ে উঠল। মুনি বললেন, 'ভয় নেই, তুমিও বেড়াল হয়ে যাও।'

মুনি এই কথা বলামাত্র ইঁদুরটা বেড়াল হয়ে গেল। একদিন একটা কুকুর তাকে তাড়া করলে। মুনি বললেন, 'ভয় নেই, তুমিও কুকুর হও।' তখন বেড়ালটা কুকুর হয়ে গেল।

তারপর একদিন একটা বাঘ কুকুরকে খেতে এল। মুনি বললেন, 'ভয় নেই, তুমিও বাঘ হও।' তখন কুকুরটা বাঘ হয়ে গেল।

সকলে বলতে লাগল, 'এই বাঘটা আগে ইঁদুর ছিল ; মুনির দয়ায় ইঁদুর থেকে বেড়াল, বেড়াল থেকে কুকুর এবং কুকুর থেকে বাঘ হয়েছে। মুনির কি আশ্চর্য ক্ষমতা'। বাঘ ভাবলে, 'যতদিন এই মুনি বেঁচে থাকবেন ততদিন সকলেই বলবে যে আমি আগে ইঁদুর ছিলাম, মুনির দয়ায় বাঘ হয়েছি।' এই ভেবে সে মুনিকে তাড়া করে মারতে গেল। তখন মুনি বললেন—

'ইঁদুর ছিলি, বেড়াল হলি,
কুকুর হলি, বাঘ হলি ;

আমার দয়া ভুলে গেলি,
আমাকেই মারতে এলি।
দয়ার যোগ্য তুমি নও,
আবার নেংটি-ইঁদুর হও।'

মুনি এই কথা বলবামাত্র বাঘ আবার ইঁদুর হয়ে গেল।

বাঘা

শ্রীসুনীল চন্দ্র সরকার

রাত দুটো-আড়াইটা হবে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিটা থেমেছে। রান্না ঘরে কি একটা ঝন্ঝন্ আওয়াজে ভেঙে গেল বাঘার ঘুম। কান খাড়া ক'রে অন্ধকারে চোখ জ্বালিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল ব্যাপার কি। শেষে দেখে এক বেড়াল। রাগ হ'য়ে গেল বাঘার। এখনো টের পায়নি ওরা যে সে রয়েছে, এখন আর আগেকার মত রেওদন্ডীবৃত্তি চলবে না এখানে। কিন্তু বাঘার মাথাটা ঠান্ডা। রাগ তখুনি প'ড়ে গেল, বুঝে দেখল যে ওদের দোষ নেই। সে যে এসেছে সেকথা জানান্ দেওয়াই হয়নি এখনো। কাজে ভুল হওয়ায় একটু লজ্জিতও যে হয়নি বাঘা তা' নয়। তখন সে জানান্ দিতে সুরু করলে ঃ

ঘৌ ! ঘৌ   ঘৌ ! ঘৌ !
শোন্ রে   বেড়াল বৌ !
সাবধান !   হুঁশিয়ার !
হ'য়েছি   পাহারাদার।

শেয়াল ! খটাস ! ভাম
শুনে নে আমার নাম,
আমি বাঘা
আমি জাগা।

ডাক শুনে ঘুম ভেঙেগে গেল উমেশের। একথা তাঁর খেয়ালই হ'ল না

যে বাঘা নিয়মমাফিক কাজ করছে, অন্যায় করেনি কোনো। মহা বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন ওপর থেকে

মিছিমিছি ফের চ্যাঁচালে
তিন থাপ্পড় মারবো গালে।

বাঘা বিমর্ষ হ'য়ে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। মনে মনে ঠিক করলে আর ডাকবে না, চোর এলেও নয়।

এর পর মিনিট দশেকও পেরোয় নি, উঠোনের মধ্যে কোথা থেকে এসে পড়ল একটা ঢিল। তার দু' মিনিট বাদে পাঁচিল টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল একটা লোক। তারপর আর একটা। বাঘা একেবারে মড়ার মত নিঃসাড়ে শুয়ে দেখতে লাগল, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না।

প্রথম চোরটা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্লে

খুলে রাখ খিড়কির দোর
চুপি চুপি যা চট্‌পট্
যদি কেউ হঠাৎ জাগে
দিতে হবে ভোঁ চম্পট্।

দোর খুলে চারদিকে অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে দ্বিতীয় চোরটা পরামর্শ দিলে

ঘরে সব হুড়কো আঁটা,
জানালায় হাত ছুটিয়ে
ঘড়ি পেন সোনার বোতাম
মনিব্যাগ আন উঠিয়ে।

প্রথম চোর

সোজা কাজ! নীচের তলায়
নেই দেখি জনপ্রাণী,

তবু তুই সজাগ থাকিস্
আমি গিয়ে মালটা আনি।

ব'লে চোরটা দোতলার সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছে। দেখে বাঘা আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না, চাপা গলায় গড়্গড়্ আওয়াজ দিলে

চোর ব্যাটা চোর
দেখি কত তেজ তোর
গর্‌র্‌র্ গর্‌র্‌র্‌র্

প্রথম চোর

ওরে ভাই বিষম ফ্যাঁসাদ
কে জানে কুত্তা ছিল
কাজে যে বাগড়া দেবে
যা হয় কিছু খাবার গিলো।

কি একটা নোংরা মত জিনিষ দ্বিতীয় চোরটা বাঘার সামনে ফেলে দিলে। ঘেন্নায় ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ক'রে বল্লে বাঘা

হুশ্! ব্যাটা হুশ্!
শেষে আমি খাবো ঘুস্?
ওফ্! ওফ্

দ্বিতীয় চোর

এ কুকুর সুবিধে নয়
রক থেকে নাম চটপট
হয়ে যাবে কেলেঙ্কারি
না দিলে ভোঁ চম্পট।

প্রথম চোরটা রক থেকে নামতে যাচ্ছে, বাঘা চেন বাঁধা অবস্থাতেই লাফ দিলে।

হুস্, হুঁসিয়ার
এই দাঁতে কত ধার
তবে দ্যাখ্ তবে দ্যাখ্
ঘ্যাঁক্

কামড় খেতেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল দুই চোর। বাঘা ডাকতে লাগল গলা ফুলিয়ে, লাফালাফি করতে লাগল পাগলের মত। উমেশ উঠে পড়লেন। ওপরের বারান্দার আলোটা জেবলে দেখেন পাঁচিলের দোর হাঁ হাঁ করছে। চেঁচিয়ে উঠলেন

এ কি এ! দোর যে খোলা!
চোর! চোর! পুলিশ! পুলিশ!
দেখে আসি বেরিয়ে পথে,
আমি এলে দরজা খুলিস।

কালোকে এই কথা বলে বেরিয়ে যাবার জোগাড়। পিসিমা কাতরাতে লাগলেন

কেন যাস্ চোরের পাছে
ও উমেশ, যাস্‌নে একা,
ধরা দিতে থাকবে কাছে
চোরেরা কি এমন ন্যাকা?

কোন কথায় কান না দিয়ে উমেশ তো গেলেন বেরিয়ে। কালো স্যায়না ছেলে, ততক্ষণ সে মিলিয়ে দেখতে লাগল ঘরের জিনিস—গিয়েছে কিনা কিছু। পিসিকে জানালে

জুতো জামা ছাতা
বই পেন খাতা

ঘড়ি মণিব্যাগ সব
ঠিক্ আছে ঠিক।

নীচের তলা থেকে পিসিমা উত্তর দিলেন

ঘটি গাড়্ব টব
ঠিক আছে সব
গামছাটা নিয়ে যদি
থাকে তবে নিক্

ইতিমধ্যে উমেশ ফিরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন

ভেগেছে! ঠিক আছে সব
ঘটি-বাটি কাপড় চাদর?

পিসি সবই আছে। আয় না তোরা
কুকুরটাকে করনা আদর।

বাঘার কথা এতক্ষণে সকলের মনে পড়ল। উমেশ ওর মাথায় থাপ্পড় মেরে চ'লে গেলেন শুতে, কাল ভোরে বেরোতে হবে। ধলো 'চোর' শুনে বিছানা থেকে এতক্ষণ ওঠেই নি। এখন নেমে এসে বাঘার ফূর্তি দেখে হেসে খুন। হাততালি দিয়ে বলে

ওঃ কি মজা! দ্যাখো দাদা
কুকুরটার কি রঙ্গভঙ্গী!

আদর করতে লাগল বাঘাকে

বাঘা! বাঘা! লক্ষ্মী সোনা
আজ থেকে তুই আমার সঙ্গী।

আবার সব ঘুমোতে চলে গেল, আবার আলো নিভল। বাঘা মনের সাধ মিটিয়ে এবার পাড়াপড়শী পশুপক্ষীকে জানান্ দেওয়ার কাজটা সারলে।

অবিশ্যি খুব বেশীক্ষণ নয়, একজন হুঁশিয়ার কুকুরের যতক্ষণ ডাকা উচিত ঠিক ততক্ষণ। এবারে আর উমেশ ধমক দিলেন না।

বাঘা

ঘৌ ঘৌ   ঘৌ ঘৌ
শোন্ রে বেড়াল বৌ
সাবধান হুঁশিয়ার !
হয়েছি পাহারাদার
শেয়াল খটাশ ভাম
শুনে নে আমার নাম
আমি বাঘা
আছি জাগা।
গর্‌র্ গর্‌র্ ঘৈঃ ঘৈঃ
আরে কোন্ আতা হৈঃ
দূরে যা চোর ডাকাত
করবো মুন্ডুপাত
শুনে নে রে পশুপক্ষী
আমি এ বাড়ীর রক্ষী
আমি বাঘা
আমি জাগা।

ছাগলে কি না খায়

সুকুমার রায়

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিগগেস করল, 'আমার কথা হচ্ছে বুঝি?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না বলতেই—তড়তড় করে সে বলে যেতে লাগল, 'তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—ছাগলে কি না খায়।' এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

'হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজ বিজ্ বিজ্, আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং বি. এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা। কোন কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোনটা কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বলো —পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়—এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই তো একটু আগে ঐ হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিছু নেই। অবশ্যি আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকেলের ছোবড়া, কিম্বা

খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কখনও খাই না। আমরা ক্বচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোষক বালিশ এসব একটু আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে তখন শখ করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিংবা চেখে দেখি যেমন পেন্সিল রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার ফুর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এ সব আমরা কোনোদিন খাই না কেউ কেউ সাবান খেতে ভালবাসে। কিন্তু সে সব নেহাত ছোটখাটো বাজে সাবান। আমার ছোটভাই একটা আস্ত বার সোপ খেয়ে ফেলেছিল—' বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা-ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল তাতেই বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।

দিন দুপুরে

শ্রীলীলা মজুমদার

সেদিন সব যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। মনে আছে ট্রামে উঠে ডান দিকের একটা কোনা দেখে আরাম করে বসলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর খালি মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে দেখছে। এইবার ট্রামসুদ্ধ সবাইকে দেখে নিলাম, বুঝতে পারলাম না কে। তারপর আবার যেই বাইরে চোখ ফিরিয়েছি আবার মনে হল কে আমাকে এমন করে দেখছে যে আমার খুলি ভেদ করে ব্রেন পর্যন্ত দেখে ফেলেছে। তাইতে আমার ভারি ভাবনা হল। এমনিতেই নানান আপদ, তার ওপর আমার ব্রেনের ভিতরকার কথাগুলো জেনে ফেললে তো আর রক্ষে নেই।

কিছুতেই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আবার মাথা ঘুরিয়ে ট্রামের প্রত্যেকটি লোককে ভালো করে দেখলাম। এবার লক্ষ্য করলাম ঠিক আমার সামনে কালো পোশাক পরা একটি অদ্ভুত লোক। তার মুখটা তিন-কোনা মতন, মাথায় গাধার টুপির মতন কালো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে লাল নীল হলদে সবুজ চক্‌ড়াবক্‌ড়া তারা-চাঁদ আঁকা, পায়ে শুঁড়ওয়ালা কালো জুতো, দুই হাঁটুর মাঝে হাতে ঝুলছে একটা সন্দেহজনক কালো থলে।

এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ভীষণ চমকে উঠলাম। দেখলাম মাথায় টুপি নয়, চুলটাই কিরকম উঁচু হয়ে বাগিয়ে আছে। গায়ে সাধারণ ধুতির উপর কালো আলোয়ান, তাতে ট্রামের ছাদের কাছের রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে রঙ বেরঙ হয়ে আলো

পড়েছে। আর পায়ে নাকতোলা বিদ্যাসাগরী চটি। খালি হাতের থলিটা সেইরকমই আছে।

কিরকম একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা খুশি হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল: "অতই যদি খারাপ লাগে ইস্কুলে যাও কেন? বড়রা যখন এতই অবুঝ তাদের কথা মেনে নাও কেন?"

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে জিগগেস করলাম: "তবে কি করব।?"

লোকটি বলল: "কি করবে? তাকিয়ে দ্যাখ নীল আকাশে ছোট ছোট শাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছেরা সব ভিজে পাতায় সোনালী রঙের রোদ মেখে বসে আছে। গড়ের মাঠের ধার ঘেঁসে পুকুরটাকে দ্যাখ, ঘোর সবুজ জলে টলমল করছে। আর, টের পাচ্ছ দখিন হাওয়া দিচ্ছে?"

মাঠের ওপারে, গঙ্গার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের ওপারে, ভারত মহাসাগরের ওপারে, কোন একটা বরফজমা দ্বীপের ওপর সারি সারি পেঙ্গুইন চলাফেরা করছে, তাদের মুখেচোখে রোদ এসে পড়েছে, ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে, দু-একটা সাদা নরম পালক উড়ে গিয়ে এখানে ওখানে পড়ছে— দেখতে পাচ্ছ না?

কি আর বলব তখন আমি যেন স্পষ্ট ঐ সব দেখতে পেলাম, আর আমার সমস্ত মনটা আনচান করে উঠল। মনে হল এমন দিনে কি কেউ ইস্কুলে যায়? এমন পৃথিবীতে কোনো দিনও কেউ ইস্কুলে যায়? আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আরেকটু আস্তে আস্তে বলল: "জান ভোর রাতে বড় বড় চিংড়িমাছ ধরতে হয়, তার এক-একটার ওজন একসেরের বেশি। দু'দিন ধরে

সমুদ্রের নিচে দড়ি বাঁধা সব হাঁড়ার মতন জিনিস ডুবিয়ে রাখতে হয়। আর ভোরবেলা গিয়ে ঐ দড়ি ধরে টেনে হাঁড়াসুদ্ধ চিংড়ি তুলতে হয়। তারপর বাড়ি ফেরবার সময় আস্তে আস্তে সকাল হয়। তুমি তো জান যে পূব দিকে সূর্য ওঠে, কিন্তু একথা জান কি যে পশ্চিম দিকের আকাশটা আগে লাল হয়, তারপর পূব দিকে সূর্য ওঠে, তারও পর পশ্চিমদিকের লাল রঙ মিলিয়ে যায়, আর সমস্ত আকাশটা ফিকে পোড়া ছাইয়ের মতন হয়ে যায়। তারাগুলোকে নিবে যেতে কখনো দেখেছ কি?

আমার মনে হ'ল আমার নিশ্চয় এখানে কিছু বলা উচিত কিন্তু আমার জিভ দেখলাম শুকিয়ে কাঠের মতন হয়ে গেছে। কিছু আর বলা হ'ল না। খালি মনটা হু হু করতে লাগলো। সে লোকটা আমার দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে বলল: "কি জন্য কলকাতায় পড়ে থাক আর ইস্কুলে যাও? জান রবিঠাকুর ইস্কুল পালিয়ে পালিয়ে অত বড় কবি হয়েছিলেন! আর জান, সাঁওতাল পরগণায় যখন মহুয়া গাছের ফল প্যাকে, তার গন্ধে জঙ্গলসুদ্ধ সব জিনিসে নেশা লেগে যায়। আর বনের ভাল্লুকগুলো মহুয়া খেয়ে খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকে। পরদিন সকালে কাঠুরেরা তাদের ঐরকমভাবে দেখতে পায়। তুমি জানতে যে মহুয়া ফল খেলে নেশায় ধরে?"

আমার তখন মনে হ'ল দিনের পর দিন ইস্কুলে গিয়ে বৃথাই জীবন নষ্ট করছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় কখনও ইস্কুলেই যায় নি।

সাত ভাই চম্পা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(১)

এক রাজার সাত রাণী। দেমাকে, বড়রাণীদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরাণী খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটরাণীকে সকলের চাইতে বেশী ভালবাসিতেন।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে—ছোটরাণীর ছেলে হইবে। রাজার মনে আনন্দ ধরে না; পাইক-পিয়াদা ডাকিয়া, রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—রাজা রাজভান্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাই-মন্ডা, মণি-মাণিক যে যত পার, আসিয়া নিয়ে যাও।

বড়রাণীরা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিলেন।

রাজা আপনার কোমরে, ছোটরাণীর কোমরে এক সোনার শিকল দিয়া বলিলেন,—"যখন ছেলে হইবে, এই শিকল নাড়া দিও, আমি আসিয়া ছেলে দেখিব।" রাজা দরবারে গেলেন।

ছোটরাণীর ছেলে হইবে, আঁতুরঘরে কে যাইবে? বড়রাণীরা বলিলেন,—"আহা ছোটরাণীর ছেলে হইবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাইব।"

বড়রাণীরা আঁতুড়ঘরে গিয়াই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা

ভাঙিয়া, ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মাণিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে, রাজা আসিয়া দেখেন,—কিছুই না!

রাজা ফিরিয়া গেলেন।

রাজসভায় বসিতে না বসিতেই আবার শিকল নাড়া পড়িল।

রাজা আবার ছুটিয়া গেলেন। গিয়ে দেখেন, এবারও কিছুই না!

মনের কষ্টে রাজা রাগ করিয়া বলিলেন,—"ছেলে না হইতে আবার শিকলে নাড়া দিলে, আমি সব রাণীকে কাটিয়া ফেলিব।" বলিয়া, রাজা চলিয়া গেলেন।

একে একে ছোটরাণীর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইল। আহা, ছেলে-মেয়েগুলি যে,—চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি! আঁকুপাঁকু করিয়া হাত নাড়ে, পা নাড়ে,—আঁতুরঘর আলো হইয়া গেল।

ছোটরাণী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"দিদি, কি ছেলে হইল একবার দেখাইলি না!"

বড়রাণীরা ছোটরাণীর কাছে রঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া, হাত নাড়িয়া, নথ নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ছেলে না হাতী হইয়াছে,—ওঁর আবার ছেলে হবে!—ক'টা ইঁদুর আর ক'টা কাঁকড়া হইয়াছে।"

শুনিয়া ছোটরাণী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নিষ্ঠুর বড়রাণীরা আর শিকল নাড়া দিল না। চুপি-চুপি হাঁড়ি-সরা আনিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া, পাঁশগাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়া আসিলেন। আসিয়া তাহার পর শিকল ধরিয়া টান দিলেন।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়া, মণি-মাণিক হাতে ঠাকুর-পুরুত সাথে আসিলেন;—বড়রাণীরা হাত মুছিয়া, মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতকগুলি ব্যাঙের ছানা ইঁদুরের ছানা আনিয়া দেখাইলেন।

দেখিয়া, রাজা রাগে আগুন হইয়া ছোটরাণীকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

বড়রাণীদের মুখে আর হাসি ধরে না ;—পায়ের মলের বাজনা আর থামে না। সুখের কাঁটা দূর হইল ; রাজপুরীতে আগুন দিয়া, ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করিয়া ছয় রাণীতে মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

পোড়াকপালী ছোটরাণীর দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী-নালা শুকায়,—ছোটরাণী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

(২)

এমনি করিয়া দিন যায়। রাজার মনে সুখ নাই, রাজার রাজ্যে সুখ নাই,—রাজপুরী খাঁ-খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না,—রাজার পূজা হয় না।

একদিন, মালী আসিয়া বলিল,—"মহারাজ,—নিত্যপূজার ফুল পাই না, আজ যে, পাঁশগাদার উপরে, সাত-চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"তবে সেই ফুল আন, পূজা করিব।"

মালী ফুল আনিতে গেল।

মালীকে দেখিয়া পারুল গাছে পারুলফুল চাঁপাফুলদিগে ডাকিয়া বলিল,—"সাত ভাই চম্পা জাগ রে !"

অমনি সাত চাঁপা নড়িয়া উঠিয়া সাড়া দিল,—"কেন বোন্ পারুল ডাক রে ?"

পারুল বলিল,—"রাজার মালী এসেছে, পূজার ফুল দিবে কি না দিবে ?"

সাত চাঁপা তর্ তর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,—আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল !"

দেখিয়া শুনিয়া, মালী অবাক্ হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া, দৌড়িয়া গিয়া সে রাজার কাছে খবর দিল।

আশ্চর্য হইয়া, রাজা, রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন।

(৩)

রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুলফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল,—"সাত ভাই চম্পা জাগ রে!"

চাঁপারা উত্তর দিল,—"কেন বোন্ পারুল ডাক রে?"

পারুল বলিল,—"রাজা আপনি এসেছেন, ফুল দিবে কি না দিবে?"

চাঁপারা বলিল, —"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর, আগে আসুক রাজার বড় রাণী,—তবে দিব ফুল।"—বলিয়া. চাঁপা ফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড়রাণীকে ডাকাইলেন। বড়রাণী মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া ফুল তুলিতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলিল,—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার মেজরাণী, তবে দিব ফুল।"

তারপর মেজরাণী আসিলেন, সেজরাণী আসিলেন, ন-রাণী আসিলেন, কনে-রাণী আসিলেন, কেহই ফুল পাইলেন না। ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মত ফুটিয়া রহিল।

রাজা গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

শেষে দুয়োরাণী আসিলেন ; তখন ফুলেরা বলিল,—

"না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী,
তবে দিব ফুল।"

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া দিলেন, পাইক, বেহারা চৌদোলা লইয়া মাঠে গিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরাণীকে লইয়া আসিল।

ছোটরাণীর হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি সুড়সুড় করিয়া চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুল ফুলটি গিয়া তাদের সঙ্গে মিশিল ; ফুলের মধ্য হইতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মত সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা "মা-মা" বলিয়া ডাকিয়া ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরাণীর কোলে-কাঁখে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

সকলে অবাক্‌! রাজার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া গেল। বড়রাণীরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

রাজা তখনি বড়রাণীদের হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত-রাজপুত্র, পারুল-মেয়ে আর ছোটরাণীকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।

রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

আফ্রিকার জঙ্গলে

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। আমরা সারাদিন হেঁটে বিশ্রামের জন্য একটা জঙ্গলে আস্তানা গাড়্‌লুম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তেই বনের কালো অন্ধকারের বুক চিরে চাঁদ উঠ্‌লো। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম, একটা ছোট পাহাড়ের উপর। আমরা যেখানে ছিলুম, সেখান থেকে প্রায় ২৫।৩০ গজ দূরে একটা বড় পুকুর। পুকুরটার প্রায় তিন দিকেই জঙ্গল। মাঠের দিকটা কেবল ফাঁকা। চাঁদের আলোয় পুকুরের জল সাদা দুধের মত দেখাচ্ছে।

পরিষ্কার জ্যোৎস্না, আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই,—সেই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সেদিন আফ্রিকার বন্যসৌন্দর্য যে কি মধুর দেখলুম তা বলতে পারিনে! সে দেখা আজও ভুলতে পারিনে, এখনো যেন চোখের উপর সেই ছবি ফুটে রয়েছে!

আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই দেখেছি, যেখানে জঙ্গলের ধারে নদী বা পুকুর আছে, রাত্রে বনের পশুরা সেখানে দল বেঁধে জল খেতে আসে। জানোয়ারের জল খাওয়া দেখতে পাবো এই আশায় আমরা সেইখানেই রাত কাটাবো ঠিক করেছিলুম। আমাদের সুমুখে সামান্য একটু জঙ্গলের আড়াল, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে সুমুখের পুকুরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

সেইখানেই আমরা জানোয়ারদের দেখার অপেক্ষায় বসে আছি। হঠাৎ আমাদেরই মধ্যে একজন আমার গা টিপে বল্লে,—"শুনতে পাচ্ছ—ঐ বুঝি আস্‌ছে।"

ছোট ছোট নুড়িপাথর ফেল্লে যেমন চট্‌পট্‌ শব্দ হয়, আমি ঠিক তেমনি একটা শব্দ শুন্‌তে পেয়ে পুকুরের জলের দিকে চেয়ে রইলুম। একটু পরেই একটা সুন্দর হরিণ একটা ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে জলের ধারে এসে দাঁড়ালো ; তাদের চঞ্চল চোখ, খাড়া কান, লম্বা মোচড়ান শিং, গায়ের লম্বা লম্বা সাদা দাগ জ্যোৎস্নার আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বড় হরিণটা চারিদিকে ভাল ক'রে একটু তাকিয়ে বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে জলে এসে নামলো। তাদের জল খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই একসঙ্গে কতকগুলো জন্তুর পায়ের শব্দ শুনেই হরিণ দুটো এক লাফে চোখের আড়ালে চ'লে গেল।

এইবার যারা আস্‌ছিল তাদের পায়ের শব্দে বোঝা যাচ্ছিল, তারা দলে অনেক এবং আকারেও বড় হবে। একটু পরেই তারা এসে হাজির—একদল জিরাফ্‌।

জিরাফের দল যখন তাদের সুন্দর লম্বা লম্বা গলা নীচু ক'রে জল খেতে খেতে এক একবার ভয়ে ভয়ে মাথা উঁচু ক'রে চারিদিকে তাকাচ্ছিল, তখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাদের। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে জিরাফ, হরিণ, কৃষ্ণসার, চিতাবাঘ, মোষ, শুয়োর, গণ্ডার, জেব্রা এবং আরও কত রকম জানোয়ার যে সেদিন দেখলুম, তার অন্ত নেই।

আমার একজন সঙ্গী বল্লে—"আজ আমরা স্বাধীন জানোয়ারদের চিড়িয়াখানা দেখ্‌ছি।" তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই একদল হাতী এসে পুকুরে নামলো। কী আনন্দ তখন তাদের। তারা আনন্দে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে শুঁড় দিয়ে জল তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে দিতে লাগ্‌লো। হাতীর ছোট ছোট বাচ্চাগুলোও বড়দের অনুকরণ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। কেউ কেউ মায়ের আশেপাশে সাঁতার কেটে খেলা করতে লাগ্‌লো।

একমনে আমরা হাতীদের সেই জলখেলা দেখ্‌ছি, এমন সময়ে আমাদের পাশের বনজঙ্গল ভেঙ্গে যেন কি একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার আমাদের দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমরা তখন বন্দুক হাতে নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে রইলুম। পরমুহূর্তেই একটা প্রকাণ্ড কালো গণ্ডারের ভীষণ মূর্তি বনজঙ্গল চুরমার ক'রে আমাদের সুমুখে এসে উপস্থিত হ'লো। চাঁদের স্পষ্ট আলোতে সেটাকে সাক্ষাৎ যমদূত বলেই বোধ হ'তে লাগলো। মনে কর্‌লুম, সে যদি আমাদের উপরে এসে পড়ে, তা' হ'লে আর রক্ষা নেই। কিন্তু সে তা' না ক'রে আমাদের বাঁ দিকের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একটা ঝড়ের মত নীচের পুকুরের দিকে নেমে গেলো। আমাদের বুকের ওপোর থেকেও যেন একটা বড় পাথর সেই ঝড়ের বেগে উড়ে গেলো। কিন্তু প্রায় ২৫।৩০ হাত গিয়েই সে আর এগুতে সাহস কর্‌লে না—তখনো পুকুরের জলে হাতী-দের জলক্রীড়া চল্‌ছিল, সে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

এমনি সময়ে আমাদের ডানদিকের ঝোপে একটা জানোয়ারের পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, প্রায় ৪০ হাত দূরে একটা জিরাফ্‌ তার লম্বা গলা তুলে ধীরে ধীরে পুকুরের দিকে যাচ্ছে। তার ভাবগতিক দেখে মনে হলো যেন হাতীদের জলক্রীড়া দেখে সে সেখানে গিয়ে জল খেতে ভয় পাচ্ছে।

আমাদের একজন সঙ্গী সকলকে চুপ কর্‌তে ইঙ্গিত ক'রে বন্দুক ধরলে। আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম,—"তুমি সব মাটি ক'রে দেবে দেখ্‌ছি,—জিরাফ্‌ও মারতে পারবে না, অথচ সমস্ত আনন্দ নষ্ট ক'রে দেবে। হয়তো বা বিপদও ঘট্‌তে পারে।"

বন্ধুবর সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে যেমন গুলি করলে, অমনি চতুর্দিকে যেন একটা প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হ'লো। চারিদিকে বন্যজন্তুর চিৎকার, গর্জন আর পলায়নের এবং গাছপালা ভাঙ্গার শব্দ ; মনে হ'লো যেন ঝড়

ভূমিকম্প এবং মেঘগর্জন একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়লুম। এমন সময় আবার আর এক বিপদ ;— আমাদের পিছনে একটা সিংহ গর্জন ক'রে উঠ্‌লো। আমরা চেয়ে দেখ্‌লুম সে আমাদের দেখতে পেয়েই কেশর ফুলিয়ে গর্জন কর্‌ছে ; ওদিকে আবার সেই গন্ডারটা আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগ্‌লো। এ অবস্থায় আমরা আর না পালিয়ে পার্‌লুম না ; কিন্তু পালাতে গিয়ে আমি একটা লতায় পা জড়িয়ে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে গেলুম। যে মুহূর্তে পড়া, ঠিক তদ্দণ্ডেই গন্ডারটা আমার পাশ দিয়ে একটা প্রচন্ড ঝড়ের মত চলে গেলো। পড়ে গিয়েই রক্ষা পেয়েছিলুম, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে সে যাত্রা আর বাঁচ্‌তে হতো না।

গন্ডারটা চলে যেতেই আমি আবার উঠে ছুট্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সুমুখে সিংহের গর্জন শুনে আর এগুতে পারলুম না দাঁড়িয়ে আমার সুমুখের লতাপাতা একটু সরিয়ে দেখ্‌তে পেলুম, আমাদেরই একজন সঙ্গী সেই সিংহটার চোখে চোখে চেয়ে আছে। চাঁদের আলোয় দু'জনকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের জনৈক শিকারী বন্ধুর মুখে শুনেছিলুম, তিনি সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়ে বাঘের মুখ থেকে এই উপায়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। বাঘের সুমুখে পড়ে গেলেই সাহস ক'রে তার চোখে চোখে চেয়ে থাকলে বাঘ আর এগুতে পারে না, শেষে হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাঘের সুমুখ থেকে ফিরে পালাতে গেলেই আর রক্ষা নেই, অমনি এসে ঘাড়ে পড়্‌বে। আমার মনে হলো, সেই উপদেশ মত বন্ধুবর আজ সিংহের মুখ থেকে বাঁচ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। দু'জনেই ঠিক পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে গুলি কর্‌বার সুবিধা থাক্‌লেও আমি গুলি করতে পার্‌লুম না, কি জানি যদি হিতে বিপরীত হয়।

কয়েক মিনিট সেই ভাবেই কেটে গেল। পশুরাজ সামান্য একজন মানুষের চোখের তীব্র চাহনি সহ্য করতে না পেরে আস্তে আস্তে বনের দিকে যাবার জন্য যেমন একটু মুখ ঘুরিয়েছে, অমনি বন্ধুবর বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি করলেন। সিংহের গর্জন এবং বন্দুকের আওয়াজ প্রায় একসঙ্গেই বনের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে তুল্‌লে।

সিংহটা সেই গুলি খেয়েই আমার দিকে লাফ দেওয়ার উপক্রম করলে। তখন আমার আর ভাবনার সময় ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে দুটো টিপকলই একসঙ্গে টিপে দিলুম।—গুড়ুম ক'রে গুলি ছুট্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড়ে বন্দুকের গোড়ালির এমন আঘাত লাগলো যে, সেই আঘাতেই আমি ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। শুধু কাদের একটা কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো, তারপর আর কিছু জানি না।

কুঠার ও জলদেবতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক দুঃখী, নদীর তীরে গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ কুঠারখানি, তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠারখানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া, সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইলা এবং কি হইল, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এত রোদন করিতেছ? সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে মগ্ন হইলেন, এবং এক স্বর্ণনির্মিত কুঠার হস্তে করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে বলিল, না মহাশয়, এ আমার কুঠার নয়। তখন তিনি পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন, এবং এক রজতনির্মিত কুঠার হস্তে লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে বলিল, না মহাশয়, ইহাও আমার কুঠার নয়। তিনি পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন, এবং তাহার লৌহনির্মিত কুঠারখানি হস্তে লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে আপন কুঠার দেখিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া বলিল, হাঁ মহাশয়, এই আমার কুঠার। আমি অতি দুঃখী; আর কুঠার পাইব, আমার এ আশা ছিল না, কেবল আপনার অনুগ্রহে পাইলাম; আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা, প্রথমতঃ তাহার নিজের কুঠারখানি তাহার হস্তে দিলেন; পরে, তুমি নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ; এজন্য আমি তোমার উপর

অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই বলিয়া তাহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ সেই স্বর্ণনির্মিত ও রজতনির্মিত কুঠার দুইখানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুঃখী ব্যক্তি অবাক্ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; অনন্তর গৃহে গিয়া, প্রতিবেশীদের নিকট এই বৃত্তান্তের সবিশেষ বর্ণনা করিল। শুনিয়া, সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। পরদিন প্রাতঃকালে সে কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল এবং গাছের গোড়ায় দুই তিন কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফস্কিয়া গেল, এইরূপ ভাণ করিয়া, কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিল, এবং হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে সমস্ত বলিয়া, সাতিশয় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা পূর্ববৎ জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বর্ণনির্মিত কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বর্ণনির্মিত কুঠার দেখিয়া, সেই লোভী, আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্র হইয়া ধরিতে গেল। তাহাকে এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র ও মিথ্যাবাদী, তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য পাত্র নহিস। এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া, স্বর্ণনির্মিত কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া, জলদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সে হতবুদ্ধি হইয়া নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। অনন্তর, আমার যেমন আচরণ, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম; এই বলিয়া সে বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

অপুর পাঠশালা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এই-টুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বে-পরোয়াভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল ; মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠো শীগগির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে ! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠো মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে,

তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে ?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে বসে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মাণিক। মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ। পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক-প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্খনো আর বাড়ী আসচিনে, দেখো।

—ষাট ষাট, বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ। পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরী করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোন ভয় নেই!—ওগো, তুমি গুরুমহাশয়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পোঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো, অপু ব'সে ব'সে লেখো, গুরু-মহাশয়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক

দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সাম্‌নে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। **একজন চুপি চুপি** বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলুম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—ফ'নে শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই দুটি ছেলে অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই স'তে, ফ'নের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো! তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে?—স'তে, ধ'রে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধ'রে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

--সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে।

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা সাধারণতঃ বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আটদশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে ; অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা, গরম রৌদ্র, বাতাবীলেবু গাব ও পেয়ারাতলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট দশটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে ; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখছিস্ ? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে ! নুটু, তোমার ক'বার নোতি ভিজুতে হবে ? ফের যদি দেখি নোতি ভিজুতে উঠেচ—

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। সহরে ছ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বেরকরা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্‌ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা অপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্‌কি চ'ড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধ-ঘোমটা-ওয়ালা ; কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ী হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর-বাঁধা হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাহিরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোন মেয়ের গায়ে সেমিজ, পায়ে জুতো, দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি, তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্‌ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্‌ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে।, ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাহিরে বেরোবার পাল্‌কি-তেও ; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পাল্‌কির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকতো মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হ'ত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগ্‌লানো, দাড়ি চোম্‌ড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়ে-

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কিভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোলভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশু রায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবার ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

দের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ 'পাল্‌কি-সুদ্ধ' গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউ-নন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হ'ত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনও বা কাঁচা শাকসুদ্ধ মুলো খেত আরামে, আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ হাঁ করে দু'হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন সহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি ; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল, তার তেজ দেখে আমরা অবাক্। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাষ্টারমশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ষ্টবুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হ'ত মাষ্টারমশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুখ্যু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আব্রু-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিট্‌মিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত-প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-

কানাচে। কোন দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাকচুন্নির নাকি সুর, দড়াম্ করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ীর পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারি ডালে এক পা, আর অন্য পা-টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত, লোকটার ধর্ম্মজ্ঞান একটুও নেই ; দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে সুড়্‌সুড়্ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁকে করে কলসী ভরে মাঘ-ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্‌টো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ি-ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হ'ত ঝর্‌ঝর্ কল্‌কল্ করে ঝরণার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্‌টো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষ-

কালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়াপড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতর বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

নামের মূল্য

কালিদাস রায়

বোধিসত্ত্ব এক জন্মে তক্ষশিলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পাপক নামে এক ছাত্র ছিল। ছাত্রটি নিজের নামের জন্য বড় লজ্জিত থাকিত। সহ-পাঠিরাও এজন্য তাহাকে গঞ্জনা দিত। পাপক গুরুর নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিল, "আর্য! আমার নামটা বদলিয়ে দিন—এ নামে আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি।"

গুরু বলিলেন, "তুমি জনপদে ভ্রমণ করে যে সকল নাম শুনতে পাবে তাদের মধ্যে যেটা পছন্দ হয় সেটা আমাকে জানাও—আমি তোমার সেইমত নামকরণ করে দেব।" পাপক জনপদ ভ্রমণে বাহির হইল। যাহাকে দেখে তাহারই নাম জিজ্ঞাসা করে। কেহ বলে; কেহ বলে না।

কতকগুলি লোক একটি বালকের মৃতদেহ দাহস্থানে লইয়া যাইতেছে। পাপক মৃত বালকটির নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহার নাম "জীবক"; নাম শুনিয়া পাপক ভাবিল—"এ কি! জীবকও অকালে মরে!" পাপক কিছু দূর গিয়া দেখিল একটি দাসীকে তাহার প্রতিপালক প্রহার করিতেছে—অপরাধ, সে হাটে পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া কিছুই লাভ করিয়া আসিতে পারে নাই। পাপক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—তাহার নাম "লক্ষ্মী"। পাপক ভাবিল, যাহার নাম লক্ষ্মী তাহারও এই দশা! কিছু দূর গিয়া একটি লোকের সঙ্গে পাপকের দেখা হইল। সে পাপককে পথের হদিশ জিজ্ঞাসা করিল এবং বলিল, "আমি পথ হারিয়েছি।" পাপক তাহাকে পথের সন্ধান দিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "আমার নাম পন্থক।"

পাপক ভাবিতে ভাবিতে চলিল। যাহার নাম পন্থক, সেও পথ হারায়! ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পাপক একটি গৃহস্থের কুটিরে উপস্থিত হইয়া পানের জন্য জল চাহিল। সে একটি কালো কুচকুচে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, "হেমাঙ্গ, একপাত্র জল আনো।" পাপক বলিল, "এত কালো ছেলের নাম 'হেমাঙ্গ' ?"

গৃহস্থ বলিলেন, "বলেন কেন ম'শায়—ছেলেটির বর্ণ গৌরই ছিল—রোগে কালো হয়ে গেছে। আর দেখুন না, এই ছেলেটির সাধ করে নাম রেখেছিলাম 'কমলাক্ষ'। বসন্ত রোগে ও হয়ে গেল কানা।—আর ঐ দুর্বল ছেলেটি দেখছেন, ওর নাম রেখেছিলাম 'বলভদ্র', ও বেচারা চিররুগ্ন হয়ে থাকল। আমি যখন ছেলেদের নাম রাখি, তখন বিধাতা অন্তরাল থেকে ক্রুর হাসি হাসেন।"

পাপকের জনপদ ভ্রমণ শেষ হইল। সে গুরুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমার নাম-বদলানোর দরকার নেই। আর্য, যে জগতে জীবক অকালে মরে, লক্ষ্মী পেটের দায়ে মার খায়, পন্থক পথ হারায়, বলভদ্রের চলিতে ফিরিতে কষ্ট হয়, কমলাক্ষ চোখে দেখতে পায় না এবং হেমাঙ্গের গায়ের রঙ কালো কুচকুচে, সে জগতে পাপক যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, নাম কেবল পদার্থ চিনিবার সঙ্কেত মাত্র, নামে কেউ বড় হয় না। সাধনাই বড়। বিনা সাধনায় উৎকৃষ্ট নাম হয় বিড়ম্বনা বা উপহাস। সাধনা থাকলে অপকৃষ্ট নামও প্রাতঃস্মরণীয় হতে পারে।"

শিক্ষক বিদ্যাসাগর

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

(মার্শাল সাহেবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর। সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় কেতাবী, কখনও চলিত। দ স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণে দোষও আছে।)

মার্শাল। নমস্কার, নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ম'শায় কাজে যোগদান করেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হ'লে এটা হ'ত না।

মার্শাল। আমি কিন্তু আশ্চর্যান্বিত, আপনার মত এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ। আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি স্বীকৃত?

বিদ্যাসাগর। আমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, আমার অনেক অধ্যাপক সেখানে এখনও শিক্ষকতা করছেন, সেখানে কি আমার—

মার্শাল। না না, এবার আমি কোন কথা শুনিতে চাই না পণ্ডিত। আপনার মত লোককে পুরস্কৃত করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না, এবার আমি নিজের মতে চলিব।

বিদ্যাসাগর। আপনি যদি সত্যই আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, তা হ'লে—

মার্শাল। [সাগ্রহে] উত্তম, বলুন, আপনার অভিপ্রায় কি?

বিদ্যাসাগর। আমাদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কোন কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন, তা হ'লে আমি বড় সুখী হই।

মার্শাল। আনন্দের সহিত। আপনি এখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হউন, ক্রমশ নূতন স্কীমে যে ইনস্পেক্টরের পদ সৃষ্ট হইবে, তাহাতেও আপনাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। মিস্টার বীটন্ আপনার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সহজেই করিতে পারিবেন। নূতন স্কীমে ইন্‌স্পেক্টরের নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার থাকিবে।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তো ভালই হয়।

মার্শাল। [সহাস্যে] আপনার নিকট আমি আজ কিন্তু একটি অনুরোধ করিতে ইচ্ছুক।

বিদ্যাসাগর। কি বলুন।

মার্শাল। অনুরোধটি শুনিবার পূর্বে আপনি একটি কথা ভাবিয়া দেখুন, যে সব সিভিলিয়ান ছাত্র আপনার নিকট বাংলা অধ্যয়ন করে, তারা আপন আপন আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া কত দূরদেশ হইতে আসে, ভাবিয়া দেখুন।

বিদ্যাসাগর। তা তো জানি।

মার্শাল। আরও ভাবিয়া দেখুন, তাহারা চাকুরী করিবার জন্যই কত কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই গরম দেশে আসে। আপনি যদি তাহাদের প্রতি একটু সদয় না হন, বেচারীরা মারা যায়—এই আমার অনুরোধ।

(বিদ্যাসাগর অনুরোধের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন।)

বিদ্যাসাগর। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সাহায্য করতে। আমার অধ্যাপনায় কি আপনারা সন্তুষ্ট নন ?

মার্শাল। না না, আপনার অধ্যাপনা খুবই সুন্দর, সব রকমে উৎকৃষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানি। উহারা আপনার মতন শিক্ষক সৌভাগ্যবলে লাভ করিয়াছে। আমি সে কথা বলিতেছি না, আমি আপনাকে কেবল একটু নরম হইতে অনুরোধ করিতেছি।

(বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন।)

বিদ্যাসাগর। তার মানে ?

মার্শাল। আমি নিশ্চয় বলিব, পরীক্ষক হিসাবে আপনি বড় শক্ত। পরীক্ষায় ফেল করিলে কিন্তু বেচারীদের চাকুরীতে—

বিদ্যাসাগর। যে পাশ করবার উপযুক্ত নয়, তাকে আমি কি করে পাশ করিয়ে দেব ?

মার্শাল। উহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটু যদি—

(বাম চক্ষুটি আবার কুঞ্চিত করিলেন।)

বিদ্যাসাগর। ওটি আমার দ্বারা হবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন তা হ'লে।

মার্শাল। [শশব্যস্তে] না, না, না—আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। ইহা শুধু অনুরোধ মাত্র। আপনি যদি রক্ষা করিতে না পারেন, আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।

বিদ্যাসাগর। যার যোগ্যতা নেই তাকে পাশ করানো মানে—বিশ্বাসঘাতকতা করা। তা আমি পারব না।

মার্শাল। বেশ, আপনার অভিরুচি অনুসারেই চলুন। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মকীর্তি ও জীবনাদর্শের কিছু পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দিতে চেষ্টা করেছি। দেশে শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা, সমাজ-সংগঠন, আর্ত-ত্রাণ, জাতীয় মুক্তি প্রভৃতি যে সব কাজের জন্যে তিনি দেশবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, তাতে তাঁর হৃদয়ের একটিমাত্র প্রেরণার পরিচয়ই পাওয়া যায় ; তা হলো, স্বদেশ ও স্বজাতির সামগ্রিক কল্যাণসাধন। বৃহত্তর কর্মজীবন ছাড়া তাঁর দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবন থেকেও বুঝা যায়, নিঃস্বার্থ মানব-সেবাই ছিল তাঁর প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাস। মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা, আর মানুষের কল্যাণকর কাজেই ভগবানের পূজা—এই সত্যই প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, যে ব্রাহ্মধর্ম তিনি জীবনের অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন, তার কেবল সমাজ ও জনহিতকর কাজের সঙ্গেই তিনি মুখ্যতঃ যুক্ত ছিলেন ; শেষের দিকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় তিনি তেমন আর যোগ দিতেন না। দেশের জনগণের, বিশেষতঃ দরিদ্র ও অবহেলিতদের উন্নতিবিধানই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত ; আর এই জন্যে আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি দরিদ্রের সাধারণ সরল জীবনই যাপন করতেন।

মানুষের কাজের ভিতর দিয়েই ভিতরের মানুষটিকে চেনা যায় এবং অন্তরের প্রেরণা তার বাইরের জীবনযাত্রায় প্রকটিত হয়ে ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন যেন ত্যাগ ও সারল্যের প্রতিমূর্তি। এই রুগ্ন ক্ষীণদেহ মানুষটি ধনে-মানে-

পাণ্ডিত্যে গৌরবের সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকেও বাঙ্গালীর সাধারণ পরিচ্ছদ—ধুতি-চাদর ও একটি গলাবন্ধ কোট বা শার্টই ছিল তাঁর নিত্য পোশাক, তাও হতো অল্প মূল্যের। কোন দিকে কোন পারিপাট্য তাঁর ছিল না, মুখে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি, চুলগুলি এলোমেলো। শেষ বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র পরতেন হাতে-কাটা সূতায় তৈরি খদ্দরের খাটো কাপড়। প্রথম জীবনে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালেও ছিল তাঁর এরূপ সাধাসিধা পোশাক—দেশী সস্তা কাপড়ের একটি সাধারণ কোট ও পা-জামা ; তাও হয়তো প্রায়ই থাকতো অ্যাসিডে পোড়া ও দাগ-ধরা। এরূপ সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদে দেশবিশ্রুত ডক্টর পি. সি. রায়কে অপরিচিত আগন্তুকদের পক্ষে চেনাই কঠিন হতো। এর অনেক কৌতুকজনক ঘটনা আচার্যদেবের জীবনে ঘটেছে। পরিচয় দিলেও অনেকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে এই সরলতা ও অন্তরের মহানুভবতা সম্বন্ধে পরলোকগত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বর্ণিত একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ে। চারুবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দিন রসায়নের ক্লাসে প্রথিতযশা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখবার জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। একটি চৌখুপি ছিটের কাপড়ের গলাবন্ধ কোট পরে রেজেষ্ট্রী-খাতা হাতে বেয়ারা ক্লাসে ঢুকলো। একটু পরে অবিকল একই কোট পরে অধ্যাপক ঢুকলেন। বিলাত-ফেরৎ বিখ্যাত অধ্যাপক, ছোট-খাটো মানুষটি, কোন আভিজাত্য নেই, টাই নেই—হ্যাট নেই, বেয়ারার মত একই কোট পরা। অবাক কাণ্ড! পরে ডিমন্‌স্ট্রেটর গুপীবাবুর কাছ থেকে চারুবাবু জেনেছিলেন, অধ্যাপক এক থান কাপড় কিনে চারটি কোট তৈরি করান ঃ তার দুটি নিজের জন্য রাখেন, আর দুটি তাঁর বেয়ারাকে পরতে দেন। ভাবলে অবাক লাগে, যৌবনেও প্রফুল্লচন্দ্রের মন কতটা উদার ও আভিজাত্য-বর্জিত ছিল।

কেবল পোশাক-পরিচ্ছদেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রফুল্লচন্দ্র অতিশয়

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন বলতে কিছু ছিল না ; তিনি ছিলেন চিরকুমার, ছাত্রদের নিয়েই ছিল তাঁর ঘরসংসার, লেবরেটরিই ছিল ঘরবাড়ী। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে ৯১, আপার সারকুলার রোডের ভাড়া-বাড়ীর দোতলার একখানা ঘরে তিনি থাকতেন, এক-তলায় ছিল তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা। একজন বেয়ারা তাঁর রান্না-বাড়া ও দেখাশুনা করতো। তার বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। রান্নাবাড়া সামান্যই, কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্রেরও বাহুল্য নেই ; শুতেন একখানা দড়ির খাটিয়ায়। ক্ষীণ-স্বাস্থ্য আচার্যদেব ছিলেন একান্ত স্বল্পাহারী, তাও ছিল সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য—ভাত, ডাল ও একটু মাছ। শোনা যায়, এক-দিন তাঁর আহারের কথা উঠতে এক ছাত্রকে তিনি বলেন—'আজ বেশ খেলাম রে—ভাত, মুসুরীর ডাল আর আলুসিদ্ধ ; খেয়ে দেখিস একেবারে অমৃত, আমি মাঝে মাঝে খাই।' আহার-বিহারে প্রফুল্লচন্দ্রের এই ত্যাগ ও সংযম সে যুগে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। মহামতি গোখলে তাঁকে 'ঋষি-রাসা-য়নিক' আখ্যা দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন—'শুনে শ্বাসরোধ হয়ে আসে যে, আচার্য রায় তাঁর রাজোচিত বেতন থেকে নিজের জন্য মাত্র কয়েকটি টাকা রাখেন ; বাকী সব জনহিতে, বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যে ব্যয় করেন।'

পদচিহ্ন

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চিত্রকূট বেড়াতে গেছি। রামায়ণের সেই স্মৃতিভরা চিত্রকূট। বিন্ধ্য-পর্বতের মধ্যে সব ঘুরে ফিরে দেখছি। রামায়ণের কত কাহিনী আবার নূতন করে শুনছি। এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ঐ ঘটেছিল। এক যায়গায় প্রকাণ্ড একটি সমতল পাথর ;—কে যেন ধরণীর দেহ পাথরে বেঁধে দিয়েছে। তারই উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনছি।

এখানেই 'ভারতমিলাপ' হয়েছিল—রামচন্দ্রজির সঙ্গে ভরতের মিলন। সীতাদেবী ছিলেন, লক্ষ্মণ ছিলেন আরও সব কে কে। বনের পশুপক্ষীরাও এই মধুর মিলন দেখতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিরহবিধুর দুই ভাই-এর মিলন—উভয়ে আলিঙ্গন করে স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন—'ভেটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো।' এই করুণ দৃশ্য দেখে সবারই চোখে ধারা বয়েছিল। পাষাণও দ্রবীভূত হয়েছিল। তাই পাষাণের বুকেও সবারই পদচিহ্ন পড়েছিল।

চিত্রকূটবাসী একজন দেখাচ্ছিলেন—এই দেখন, এইটে রামচন্দ্রজির, এইটে ভরতের ;—এই এদিকে সীতাদেবীর, এই দেখুন সব পাখীর পায়ের ছাপ ; এই এখানে সব বনের পশুর।

শুনছি আর দেখছি। আশ্চর্য লাগে পাথরের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নগুলি। মানুষের তৈরী নয় দেখলেই বোঝা যায় ; কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে পাথরের উপর বিচিত্র এইসব রেখা। কোন-কোনটি মানুষের পায়ের ছাপের মতই লাগে, কোনটি-বা পশু-পক্ষীর মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের মত নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত এর কোন কারণ নির্দেশ করবেন। তা করুন বাধা নাই।

তবে, সেই অপূর্ব আবেষ্টনীর মাঝে এই বিচিত্র রেখাগুলির সাহায্যে কারও কল্পনা-বিলাসী বিশ্বাসী মন যদি রামায়ণের সেই করুণ কাহিনীর আলেখ্য এঁকে ক্ষণিক তৃপ্তি পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

বদরিনাথ

জলধর সেন

২৯শে মে, শুক্রবার—কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকনন্দা পার হোয়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথ প্রবেশ করলুম। বদরিনাথের পথে যখন চল্‌ছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ, মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এসে সে সমস্তই যেন সংযত হোয়ে গেল। এই রকমই হোয়ে থাকে।

বদরিনাথে প্রবেশ কোরেই চারিদিকে একটা নিরুদ্যম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হোলো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্মের মর্মে মর্মে বিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে, একটা অলস কর্ম-হীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকনন্দা অতি নিরুদ্বেগে মন্থর-গমনে বরফরাশির নীচে দিয়ে চোলে যাচ্ছে ; সহরের অধি-কাংশ ঘর-বাড়ী এখন পর্যন্তও বরফের তলায় পড়ে আছে !

হিমালয় পর্বতের মধ্যে এত দূরে জনমানবশূন্য চিরতুষাররাশির ভিতরে এতখানি সমতলভূমি দেখলে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার হোতে বদরিকাশ্রম দুই শত মাইলেরও বেশী। হরিদ্বার থেকে যাত্রা কোরে এতদূর এসেছি, এর মধ্যে যা' কিছু অল্প সমতল জমি দেখেছি তা' শ্রীনগরে, তা' ভিন্ন সমস্ত জায়গায় "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" অষ্টাবক্রবিশেষ। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী গম্ভীর ; এ গাম্ভীর্যের সহিত স্বতঃই সাগরের গাম্ভীর্যের তুলনা কোরতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই দুই জিনিষের মধ্যে আশ্চর্য রকমের তফাৎ। একটি মহা উচ্চ, অসমান, কঠিন, সুদীর্ঘ

শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি—আর একটি সুগভীর, সমতল, উদ্ভিদের নাম বর্জিত, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গভীর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন ; তবু এ দুইয়ের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে তা' ঠিক বলা যায় না ; বোধ করি এ উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে ; এই মহান্ সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্বপিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটি দেখে আর একটির কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই তো গম্ভীর দৃশ্য, তার উপর বদরিকাশ্রমের দৃশ্যটা আরও গম্ভীর। দুই দিকে দুইটা পর্বত একেবারে আকাশ ভেদ কোরে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধ ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে। পান্ডাদের মুখে শুনলুম, এই দু'টি পর্বতের একটির নাম "নর", অপরটির নাম "নারায়ণ"। আরও শুনলুম, এই পর্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হোচ্ছে। শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্ধিত-কলেবর হোয়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেলবে, সুতরাং বদরিকাশ্রমতীর্থ চিরদিনের মত হিমালয়ের পাষাণ-বক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পান্ডারা এই ভরসা করে যে, দুই চারি শত বছরের মধ্যে সে রকম দুর্ঘটনা ঘট্‌বার কোন সম্ভাবনা নেই।...

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত তা' অতি সুন্দর! শুধু ভক্তের নয়, কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে। এই পুণ্যভূমি ভেদ কোরে অলকনন্দা প্রবাহিত হোচ্ছে ; কিন্তু বছরের বেশী সময়ই তা' বরফে আচ্ছন্ন থাকে।

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা ; দৈর্ঘ্যে বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশী নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ বোলে বোধ হয়। দৈর্ঘ্যে এতখানি হোলেও প্রস্থে বেশী নয় ; আরও দেখলুম, প্রস্থদেশ খানিকটা ঢালু, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তবে তা' বুঝতে পারা যায়, নইলে সহসা বোধগম্য হয় না। দূরের পর্বত থেকে অনেকগুলি ঝরণা বের হোয়ে অলকনন্দায় পড়েছে এবং নদীবক্ষে বরফ ভেদ কোরে সেই জল ধীরে

ধীরে চলে যাচ্ছে। উপরে যে কূর্মধারার কথা বোলেছি তা' এই বদরিনাথের বাজারের মধ্য দিয়ে নেমে নদীতে পড়েছে। এই ঝরণাতে বাজারের লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। কূর্মধারা ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরণা আছে !...

বদরিনাথে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখতে তত পুরাতন ব'লে বোধ হয় না ; তবে যে অল্পদিনের তাও নয়। মন্দিরের বাহিরে চারিপাশে সামান্য একটা উঠান। এই উঠানের চারিদিকে একটা একমহল ছোট চক, তাতে অনেক ছোটখাট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের সঙ্গে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এগুলি পান্ডা-ঠাকুরদের রোজগারের অবলম্বন মাত্র। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যখন এঁদের স্হান হোয়েছে, তখন এঁরা মাহাত্ম্য অংশে নিতান্ত খাট নয়, এই হেতুবাদে পয়সাওয়ালা অনেক যাত্রী এই সকল বিগ্রহের মাথায় দুই-এক পয়সা চড়ায় (অর্থাৎ প্রণামী দেয়)। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দ্বার আছে, তার কবাট অতি প্রকান্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশেরই মন্দিরের মতই। মন্দিরের গায়ে বিশেষ কোন কারুকার্য দেখলাম না ; আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকমের বৈচিত্র্যবিহীন, এও তাই ; তবে দেবমাহাত্ম্যেই এর মাহাত্ম্য এত বেশী। উঁচুতে কালিঘাটের মন্দিরের চেয়েও খাট বলে মনে হোলো ; তবে এটি আগাগোড়া পাথরে গাঁথা—এ-পাথরের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্মিত, তার পক্ষে, এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়। এদিকে যত মন্দির দেখলুম, সকলগুলিই পাথরে গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হয়েছে ; কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে তেমন জীর্ণ বোলে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ-মন্দির শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। এ-কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, এ বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ। কিন্তু মন্দিরটি দেখলে কেউ এ-কথা বিশ্বাস কোরবেন না যে, এটি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত,—এমন

আধুনিকের মত দেখায়! আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হোয়েছিলুম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম যে, মন্দিরটি বছরের মধ্যে আট-ন' মাস বরফের নীচে ঢাকা থাকে, রৌদ্র-বৃষ্টির সঙ্গে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, সুতরাং তার উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অল্পই সম্ভাবনা।

এখন পর্যন্ত অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি, কিন্তু বাল্যকাল হোতে শুনে আসছি, বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মূর্তি পরশপাথরে নির্মিত। স্পর্শমণি উপকথার বস্তু এবং কল্পনা ও কবিতাতে কখনও কখনও তার শক্তি অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি সে-রকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাক্‌তো, তা' হোলে এই ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনে অনেকের পক্ষে সুবিধার কথা ছিল।

৩০শে মে, শনিবার (১৮৯০)—সূর্যোদয় হোলো। অত্যন্ত ব্যস্ত হোয়ে নারায়ণ দর্শন কোরতে বের হয়ে পড়লুম ; কিন্তু শুনলুম বেলা আটটার আগে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় না।...মন্দিরের চকের বাইরে একটা ক্ষুদ্র ডাকঘর বসেছে। এটি সাময়িক পোষ্টঅফিস ; যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ হোলে এ পোষ্টঅফিস বন্ধ হবে।...আমি খানকতক পোষ্টকার্ড কিনে দেশে চিঠি লিখতে প্রস্তুত হোলুম।

পত্র লিখে যখন বাইরে এলুম, তখন শোনা গেল মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হোয়েছে। তখন মহাহর্ষে মন্দিরে প্রবেশ করা গেল।

চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি দৃষ্টিগোচর হোলো। মূর্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাথরে প্রস্তুত। বিগ্রহের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার। অলঙ্কার নারায়ণের আপাদমস্তক ঢেকে ফেলেছে! সেই মণিমুক্তা-হীরকাদি জড়িত হেমাভরণের মধ্য হোতে একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি বিকশিত হচ্ছিল। তা' দেখলে

মনে বাস্তবিকই বড় আনন্দের সঞ্চার হয়। নারায়ণের শরীরস্থ মণিমুক্তাদির জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত। পূর্বে গল্প শুনেছিলুম, ভাদ্রমাসে যেদিন মন্দির-দ্বার বন্ধ হয়, সেদিন মন্দির মধ্যে যে প্রদীপ জেবলে রাখা হয়, বৈশাখ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ এই নয় মাসকাল অনবরত তা' জ্বলতে থাকে ; আর যে সমস্ত নৈবেদ্য কোরে দেওয়া হয়, এ দীর্ঘকালেও তা' নষ্ট হয় না, যেমন তেমনই থাকে।

বদরিনারায়ণের এই বহুমূল্য অলঙ্কার প্রাচুর্য দেখে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মহিমা নিখিল দেবমহিমার উপরে, সুতরাং নানা দেশ-বিদেশের রাজাগণ বদরিনাথকে কত মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিয়েছেন তার সংখ্যা নেই।......আমাদের সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আমার হৃদয়ে যত ভক্তির না উদ্রেক হোক্ এই সকল সমাগত যাত্রীর ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে আমি মোহিত হোয়ে গেলুম, আমার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হোলো।

তড়িৎ ও চুম্বকের আবিষ্কার

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পৃথিবীতে মানুষ যখন ছিল না, তখনও তড়িৎ ছিল। আদিম মানব এর ক্রিয়া দেখল, এর ধ্বংসলীলা দেখে বিভ্রান্ত হল, কিন্তু একে ঠিক বুঝল না। না বুঝবার কারণ এই যে মানবের এমন কোন ইন্দ্রিয় নেই যা দিয়ে সে সোজাসুজি তড়িতের পরিচয় লাভ করতে পারে। তড়িৎ যখন তাপের সৃষ্টি করে তখন স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা সেই তাপ অনুভব করি, যখন শব্দ উৎপন্ন করে সেই শব্দ আমরা শুনি, যখন আলো জ্বালায় সেই আলো আমরা দেখি। তড়িৎকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার জন্য আমাদের কোন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় না থাকলেও আজ আমরা চিরপরিচিত তাপ, আলো, শব্দ অপেক্ষা তড়িতের নিবিড় পরিচয় পেয়েছি, আর একথা জেনেছি যে, তড়িতের মত অনুগত এবং শক্তিমান সেবক মানুষের আর নেই।

ঘর্ষতড়িতের প্রথম উদ্ভব—গুহাবাসী মানব যেদিন প্রথম তার চামড়ার পোষাকের সংগে তার অ্যাম্বার (amber)-নির্মিত অলংকার ঘষল, সেদিন সে তড়িতের সৃষ্টি করল। কিন্তু সে কোন দিন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না। এ বিষয়ে ইতিহাসের প্রথম সংবাদ হল এই যে, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছ'শ বছর আগে গ্রীসদেশে মিলিটসের থেল্‌স প্রথম অ্যাম্বারের এই ধর্ম লক্ষ্য করেন। গ্রীক ভাষায় অ্যাম্বারের প্রতিশব্দ হল ইলেকট্রন, তাই সেই সময় থেকে ইংরেজিতে এই নতুন শক্তিকে ইলেকট্রিসিটি বলা হচ্ছে।

থেল্‌স সম্বন্ধে একটি গল্প চলিত আছে। গ্রীসদেশে তিনিই প্রথম আকাশে নক্ষত্রগণের গতিপথ লক্ষ্য করেন। একদিন আগ্রহাতিশয্যে আকাশের দিকে

দৃষ্টিপাত করতে করতে তিনি এক কুয়ার মধ্যে পড়ে যান। তাঁর পরিচারিকা হেসে মন্তব্য করে—উপরের দিকে দেখবার উৎসাহে কর্তা আর নিচের দিকে তাকান না। পরে বহু বিজ্ঞানীও পার্থিব ব্যাপারে দৃষ্টি রাখেন নি বলে উপহাসিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরাই পৃথিবীকে তার অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছেন।

চুম্বকের আবিষ্কার—থেল্সের সময় তড়িৎ-বিজ্ঞানের আরম্ভ হোলেও মানব চুম্বকের পরিচয় লাভ করে আরও অনেক আগে। কথিত আছে, খৃষ্ট-জন্মের দু'হাজার বছর আগেও চীনাবাসী চুম্বক দিয়ে তৈরী দিগ্দর্শন যন্ত্র ব্যবহার করত।

আদিম যুগ থেকে মানব স্থান হতে স্থানান্তরে সংবাদ পাঠাতে অনেক রকম দূতের সাহায্য নিয়েছে, আগুন জেবলে ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে, শিক্ষিত পায়রা ছেড়েছে। প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে ইংলন্ডের দক্ষিণ-উপকূল-বাসীরা যখন দেখল যে স্পেনদেশের জাহাজ ইংলন্ড আক্রমণ করতে আসছে, তখন তারা আয়না দিয়ে আলো ফেলে সংবাদটা ইংলন্ডবাসীকে জানাল, এর চেয়ে কোন ভাল উপায় তখন অবধি জানা ছিল না। বর্তমান যুগে যখন টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে, বেতারে এক স্থানের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে পাঠানো হচ্ছে, তখন আগেকার যুগের উপায়গুলি এ যুগের মানুষের কাছে একেবারে ছেলেখেলা বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের এই আবিষ্কারগুলি এবং আরও অনেক আবিষ্কার মানুষের কাছে অপরিজ্ঞাত থাকত যদি-না সে বিজ্ঞানের একটা সত্য জানত, সে সত্যটা হল এই—চুম্বক লোহাকে টানে। শুধু চীন দেশের নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের লোকেরাও চুম্বকের এই গুণ দেখে বিস্মিত হল, এ নিয়ে অনেক আজগুবি গল্পের সৃষ্টি হল।

লোকজন-মালপত্র-বোঝাই জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ জাহাজের পেরেকগুলি সব খসতে আরম্ভ হল। জাহাজে জল উঠতে লাগল। হঠাৎ এরকম কেন হল, অনুসন্ধানে জানা গেল, সমুদ্রের ভিতরে এক চুম্বকের পাহাড় ছিল, চুম্বকের টানে জাহাজের পেরেকগুলি খসে গেল। চুম্বক লোহাকে টানে একথা সত্য, আর প্রকৃতির রাজ্যে অনেক ছোট-বড় চুম্বক আছে, এও ঠিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন শক্তিধর স্বাভাবিক চুম্বকের সন্ধান পাওয়া যায়নি যা জাহাজ থেকে পেরেক টেনে বার করতে পারে (কয়েক বছর আগে আমেরিকায় প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্রের নির্মাণকালে তড়িৎ-চুম্বকের আকর্ষণে জানালা দরজা থেকে লোহার পেরেক বেরিয়ে আসে, তবে এ চুম্বক ছিল মানুষের তৈরী কৃত্রিম চুম্বক, স্বাভাবিক চুম্বক নয়।)। আর একটা গল্প এই রকম। মিশর দেশের এক রাণীকে তাঁর মৃত্যুর পর একটি লোহার সিন্দুকে রাখা হয়। মাটির অনেক উপরে এক চুম্বক রেখে সিন্দুকটিকে মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়। উপর থেকে চুম্বকের আকর্ষণ আর নিচের দিকে পৃথিবীর টান, ফলে সিন্দুকটি চিরদিন শূন্যে ঝুলতে থাকল। অবশ্য এ বাক্স আজও কেউ দেখেনি।

তড়িতের আলোচনায় চুম্বকের কথা এসে পড়ে, কারণ তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ।

চুম্বক আর তড়িৎ আবিষ্কারের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানব ওদের সম্বন্ধে নতুন কোন কথা জানল না।

কপোত-কপোতী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কারো থাকে যেন প্রতারিত হতে সখ,
প্রতারিত চেয়ে বেশী ঠকে প্রতারক।

দিগ্‌নগরে নীলমাধব ও কনকলতা নামে এক ব্রাহ্মণদম্পতি বাস করিতেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁহাদের নাকি একটি পুত্র হইয়াছিল, গঙ্গাসাগর মেলায় সেটি মারা যায় বা হারাইয়া যায়। কেহ কেহ বলে, মানত অনুযায়ী তাহাকে সাগরে বা এক সন্ন্যাসীকে দিয়া আসেন। সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলে কনকলতার চক্ষু ছলছল করে।

ইঁহাদের সুরম্য বাসভবন ফুলেফলে সুশোভিত ছিল। নীলমাধবের পাখী পোষার একটা খেয়াল ছিল। দেশী-বিদেশী বহু পক্ষী তিনি পালন করিতেন। তাঁর খিড়কীর বৃহৎ সরোবরে চক্রবাক, চক্রবাকী, সারস প্রভৃতিও চরিত। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, শ্যামা, বারান্দায় সর্বদা নানা বুলি বলিত। একটা ময়না ঠিক মানুষের ন্যায় স্বরে 'তোমায় ভুলে আছি' এই বুলি বলিত। সেটা উড়িয়া যাওয়ায়, তাহা ধরিবার জন্য নীলমাধব একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। একজন ব্যাধ দেড় বৎসর পরে ওইরূপ বুলি শিখাইয়া একটা ময়না আনিয়া 'বাবুরই ময়না, বনে ধরিয়াছি' বলিয়া পুরস্কার লইয়া যয়। পতিপত্নী উভয়েই দানে মুক্তহস্তে ছিলেন। নীলমাধবের আর একটা সখ ছিল—সেটা কিছু আধ্যাত্মিক—তিনি বিশ্বাস করিতেন, অরণ্যে যে সব সাধু তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদের পুণ্যবলে সমস্ত মানবজাতি উন্নত হইয়া ক্রমে

দেবত্ব লাভ করিতে চলিয়াছে—সেই সুদিন প্রায় সমাগত। এ সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা তাঁর অতি প্রীতিকর ছিল।

হরপুর গ্রামে শনিরাম আচার্য বাস করিত। ভাঁটার মত প্রকাণ্ড তার দুই চক্ষু—ততোধিক প্রকাণ্ড তার নাসিকা। দীর্ঘ রুক্ষ মূর্তি, গম্ভীর অনুনাসিক স্বর এবং ভীতময় অঙ্গভঙ্গিতে তার একটা অপদৈবী ভাব ছিল।

বহু গ্রাম সে ঘুরিত, নানাবিধ ফাঁড়া ও তাহার আশু প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। প্রভাতে উঠিয়া নানাবিধ কবচ বিক্রয় করিত, ঠিকুজী-কোষ্ঠী লিখিত এবং নানা যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া বহু সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ হইতেও সে অর্থ আদায় করিত।

এক সুযোগে শনিরাম এই আতিথেয় দম্পতির সহিত আলাপ করিল। কনকলতার হাত দেখিয়াই সে দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শনিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ধন্য ভাগ্যবতী, এমন হাত কমই দেখিয়াছি। আমি গুরুকৃপায় হাত দেখিয়া সাত জন্মের কথা জানিতে পারি। তিন জন্মের কথা, দর্পণে দেখার মত দেখিতে পাই।

"তোমরা ছিলে বিন্ধ্যাটবী নামক মহারণ্যে কপোত-কপোতী—উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ায় ছিল তোমাদের বাসা। পক্ষী হইলেও তোমরা ছিলে দেবভাবাপন্ন।

"গভীর শীতের রাত্রিতে এক ব্যাধ ও তাহার শিশুপুত্র শীতে ও অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় তোমাদের বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শুষ্ক পত্রে শমী-কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি জ্বালাইয়া কোনরূপে শীত নিবারণ করে, কিন্তু তিন-দিন অনাহারী শিশু কি খাইবে? তোমাদের হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইল।"

"কপোত বলিল—'কপোতী কি কর্তব্য ? কি দিয়া অতিথি সৎকার করি' ?"

"কপোতী—'আমাদের দেহ ভিন্ন ত দানের অন্য কিছুই নাই—চল, উহা দান করিয়াই শিশুকে বাঁচাই। তুমি থাক, নূতন নীড় পাতাও, আমি যাই।'—বলিয়াই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সদ্য আহার্য লাভে ব্যাধ ও তাহার পুত্রের মুখে হাসি ফুটিল—কপোতী সেই হাস্যেই জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে প্রাণ বিসর্জন করিল। কপোতও তাহার অনুসরণ করিল। তোমরা সেই কপোত-কপোতী। দূর জন্মে তোমরা ছিলে ধরা-দ্রোণ। একজন্মে তোমরা ছিলে কপিলাবস্তুর রাজা-রাণী—ভগবান অমিতাভের জনক-জননী। মা, এসব কথা গোপনীয়। ভাগ্যবতীরাই ইহা বিশ্বাস করেন। তোমাদের সন্তান কোন জন্মেই সংসারে থাকিবেন না। ভক্তিমতীর গর্ভেই ভগবান যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তোমাদের পুত্র বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাকে পাইবে, তবে তিনি গৃহী হইবেন না।"

কনকলতা গণকের কথায় যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন—বিশ্বাসে, আনন্দে, ব্যথায় আত্মহারা হইলেন। এই ধনীগৃহ শনিরামের একটা লাভের কেন্দ্র হইল।

কত অলস বৈকালে—কত বিনিদ্র রজনীতে কনকলতা সেই পুণ্য বিন্ধ্যাটবীর কথা ভাবেন। কখনো ভাবেন ধরা-দ্রোণের সেই পবিত্র সর্বত্যাগী জীবন তাহাদেরই। কখনো মনে পড়ে কপিলাবস্তুর সেই রাজ্য—সেই বুদ্ধরূপী পুত্র। আবার কখনো মনে করেন এ সব মিথ্যা—আমরা সামান্য নরনারী—এত বড় সৌভাগ্য জন্ম-জন্মান্তরেরও দূরাশা। কখনো গণকের কথায় গভীর বিশ্বাস আসে। তাহাদের হারানো মাণিক ফিরিয়া পাইবেন, মন উৎকণ্ঠিত হয়, উল্লসিত হয়, আবার কখনো কেবল নৈরাশ্য মনকে অধিকার করে।

শনিরাম বৎসর বৎসর আসে, নানা সান্ত্বনা ও আশার কথা বলে এবং অর্থ লইয়া চলিয়া যায়। নীলমাধব স্ত্রীকে উপহাস করিয়া বলেন—"কপোতী, বোধ হয় তোমার সেই পূর্বজন্মের ব্যাধই এ জন্মে গণক হইয়া আসিয়াছে—সে জন্মে মাংস খাইয়াছে, এবার রুধীর শোষণ করিতেছে।" পত্নী বলেন—"উহা বলিতে নাই। কার কি শক্তি আছে বলা যায় কি? দৈববলে কি না হয়?"

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই ; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়। সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা ; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রিদার জ্ঞাতি ডিক্রি জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ; ডিক্রিদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল ; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিবি-কৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস ; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু সুস্থ হইলে পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথায় ? কি দিবে ?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই-একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মা'র পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুসলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডাবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, “কে গা তুমি কাঁদ?”

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে— কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, “আমি দুঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই। কেবল মা আছে।”

সে পুরুষ বলিল, “তুমি কোথায় গিয়াছিলে?”

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই ; কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হাঁ রাধারাণী ! তুমি ছেলেমানুষ, একলা রথ দেখিতে গিয়েছিলে কেন ?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের

বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে আমার মা খেতে পাবে না।—তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকছে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্‌ করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্‌ করচে।"

রাধা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জেবলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে

দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।”

“আচ্ছা।”

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণ বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সকাতরে বলিল—“মা! এখন কি হবে?”

মা বলিল, “কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।”

তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে।

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে—একযোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া

আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা জানি না। রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল ; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইহাদের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইতেন।

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না। যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্ন মনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া তৈল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভি-

প্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"একি কি মা!" মা দেখিয়া কহিলেন—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।" মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড় ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষর পরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা!" মা বলিলেন, "তাহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না।

নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল। তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

রামের সুমতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ সকাল-বেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থচারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্ছে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাষ্টারমশাই ব'লেছেন অশ্বত্থের ছায়া খুব ভাল। গোবিন্দ, যা ঘটি ক'রে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে বাঁশ কেটে আন্—বেড়া দিতে হবে। নইলে গরু-বাছুর খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ! এমন ছিষ্টি-ছাড়া কান্ড কখনও বাপের বয়সে দেখি নি বাবা!

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইতে ঘটিটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে, আমি জল আনি গে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন,

কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারাণি, চেয়ে দেখ্। তোর দেওরের কান্ডটা একবার দেখ্, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ পুঁতে বলে কি না ছায়া হবে! আবার ওদিকে দেখ্ হতভাগা ভোলার কান্ড! একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুক্‌ছে—বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই এক-রাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামী, সমস্ত জিনিষটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠান্ডা ছায়া হবে বলত, আর এই যে ছোট ডালটি দেখছ,—উটি বড় হ'লে—এই গোবিন্দ, আঙুল দেখাস্ নে—বড় হ'লে, গোবিন্দর জন্য একটা দোলা টাঙিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু ক'রে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে, কাটারীখানা আমার হাতে দে, তুই পারবি নে। খট্-খট্ ঠক্-ঠক্ করিয়া বাঁশ কাটা সুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্ষাস্থিত পূর্ণ কলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বল্‌লি নে? ঐখানে তবে অশ্বত্থ গাছ হোক?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অত বড গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড় বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাল্‌লেই বাঁচবে? ওত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস্ ত উপড়ে দে্ গে।

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন, বাড়ী কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ ন'স? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়! মা গো, অশ্বত্থ গাছের উপর এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোঙরা করবে—আমি ত নারাণি, তা হ'লে থাকতে পারব না। ওকে তোদের এত ভয় কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ী হ'ত নারাণি, তা হলে দেখতুম, ও কত বড় বজ্জাত। একদিনে সোজা ক'রে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভেতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন কি বুদ্ধি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের

বাড়ীর উঠোনে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে? দুদিন থাক, তারপরে আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে? ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও কাজ করো না, তোমাকে বলচি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর ভাইও ছুঁতে সাহস করবে না মা। আজকের দিনটা যাক্।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়্‌গে যা।

দুপুর বেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিসের ওড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা, সর্বনাশ হয়েছে? দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে আর কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছ নাই। বলিলেন, মা, রামের গাছ কি হ'ল?

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপনা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই!

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটি শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে

গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বল্‌চি, এদিকে আয়।

না, যাব না। কই আমার গাছ ?

এদিকে আয় না, বল্‌চি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ গাছ পুঁততে আছে রে ?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয় ?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে বাড়ীর বড়-বৌ মরে যায় যে !

রাম এক মুহূর্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা !

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

কই পাঁজি, দেখি ?

নারায়ণী মনে মনে বিপদগ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে ? মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতে নেই— তুই দেখ্‌বি কি রে ? এ কথা যে ভোলাও জানে ? আচ্ছা ডাক তাকে।

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড় বধূর গলা

জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমি জানি ; কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি ?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি মরে গেলে তুই কি করবি ?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যা বলতে নেই !

নারায়ণী অলক্ষে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম, মরব না রে! এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি? একটি দাঁতও পড়ে নি, একটি চুলও পাকে নি ?

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মর্‌ব। নাইতে যাব আর ফিরে আসব না।

কেন, বৌদি ?

তোর জ্বালায়। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস নে, দিন রাত ঝগড়া করিস্‌। সেই দিন তোরা টের পাবি, যে দিন আমি আর ফিরব না।

কথাটি রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না ; কিন্তু ও কেন আমাকে অমন করে বলে ?

বললেই বা? উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্‌ ওঁকেও তেমনি ভালবাস্‌বি।

রাম আবার বৌদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া সে এই দীর্ঘ তের বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সে এতবড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে। এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য!

নারায়ণী আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে বল্।

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া নিয়া বলিলেন, কাজকর্ম নেই নারাণি? দেওরকে নিয়ে সোহাগ হ'চ্ছে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেটা সারা হয়ে গেল কিসে?

কিসে? বেশ! বলিয়া দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

পদ্যাংশ

শ্রীরামচন্দ্রের নবমী পূজা

কৃত্তিবাস ওঝা

নবমীতে রঘুপতি পূজিবারে ভগবতী
উদ্‌যোগ করিলা ফল ফুল।
বেদবিধিমতে যত আনিলা সামগ্রী কত
কপিগণ যোগাইছে ফুল॥

অশোক-কাঞ্চন জবা মল্লিকা মালতী ধবা
পলাশ ও পাটলী বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত বনপুষ্প নানা মত
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল॥

রক্তোৎপল শতদল কুমুদ কহ্লার নল
আমলকীপত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর কনক চম্পক সার
কোকনদ সহস্রেক পাত॥

অতসী অপরাজিতা যাতে দুর্গা হরষিতা
ঝম্পক চম্পক নাগেশ্বর।
কাঠমল্লিকা দোপাটি যাতি যূথী আচিঝাঁটি
দ্রোণ পুষ্প মাধবী টগর॥

তুলসী তিসী ধাতকী ভূমিচম্পক কেতকী
পদ্মবক কৃষ্ণকেলী আর।
স্বর্ণযূথী বাঁধুলী শীষ শিউলী আঁধুলি
কুরুচি গোলাপ পুষ্প সার॥

কৃষ্ণচূড়া চমৎকার পুষ্পে রাখে ভারে ভার
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন করিল বানরগণ
অপূর্ব অপূর্ব বনফলে॥

আলোর বাণী

সুনির্মল বসু

যবে শুকতারা হেসে থাকে আকাশ কোণায়
যবে পাখীদল অবিরল গানটি শোনায়
সেই খুব ভোরে উঠি আমি ঘুম ছেড়ে মোর,
রবি পাখনা মেলে না তার রঙীন্ আলোর।
পরে রাঙা আলো ওঠে' জেগে
উদয় সময়
যেন প্রকৃতিকে মনে হয়
বড় রসময়।
বায়ু ঝির ঝির বয়ে যায়
লতায়-পাতায়
ফুলে সৌরভ, সকলের
পরাণ মাতায়।
আসে প্রজাপতি ডানা নাড়ি'
ফুলের মেলায়
যেন উৎসব জমে ওঠে'
ভোরের বেলায়।
ক্রমে রবি ওঠে' পূবাকাশে রঙে ঝলমল্,
দেখে অপরূপ রূপ তার প্রাণ চঞ্চল।

ভোরে সোনালী রঙীন্
আলো ঝর্ণা ঝরায়
তা'তে নদীর রূপালী
জলে বর্ণ ছড়ায়।
বসে নিরিবিলি নদীধারে
খুশি মোর মন
যেন নয়নে ঘনায়ে আসে
সোনার স্বপন।
ওরে এমন সরস ভোরে
ঘুমায়ে কে ভাই ?
এলো নতুন আলোর বাণী.
শুনতে যে পাই !
যত দেহের জড়তা আর
মনের বিকার
সবি ঘুচে যাবে, মুছে যাবে,
ভাবনা কি আর।
নব জীবনের সাড়া পাই
আলোয় হাওয়ায়
যেন নবীন চেতনা জাগে
উষার চাওয়ায়।
আজি নতুন বরষ
শুভ আশিষ ছড়ায়
আনে প্রচুর আশার বাণী
বসুন্ধরায়।

জ্ঞানী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক,
পড়েন তিনি দিনরাত্তির গল্প এবং নাটক,
কবিতা আর উপন্যাসের বেজায় তিনি ভক্ত,
ডিটেকটিভের কাহিনীতে গরম করেন রক্ত ;
জানেন তিনি দর্শন আর নানা রকম বিজ্ঞান
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি, তাইতো আছে দিক্-জ্ঞান ;
ইতিহাস আর ভূগোলেতে বেজায় তিনি দক্ষ,—
এসব কথা ভাবলেই তাঁর ফুলতে থাকে বক্ষ।
সব সময়েই পড়েন তিনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে,
ছুটির দিনে পড়েন তিনি, পড়েন পুজোর বন্ধে।
মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন গূঢ় জ্ঞানের তত্ত্ব
বিদ্যেখানা জাহির করেন বরেন্দ্রনাথ দত্ত ;
হঠাৎ ঢুকে রান্না ঘরে বলেন ওসব কি রে ?
ভাইঝি গীতা হেসে বলে, এসব কালো জিরে।
বরেনবাবু রেগে বলেন, জিরে তো হয় সাদা,
তিলও কালো, জিরেও কালো ? পেয়েছিস কি গাধা ?
রান্না করার সময় কেবল পুড়িয়ে হাজার লংকা,
হনুমতী হয়েছিস তই, হচ্ছে আমার শংকা।

হঠাৎ ছোট্ট খোকাটাকে কাঁদতে দেখে' দত্ত
খোলেন বিরাট বইয়ের পাতা নামটি "মনস্তত্ত্ব"।
খুঁজতে খুঁজতে বরেনবাবু হয়ে গেলেন সারা—
বুঝলেন না, কেন খোকা মাথায় করছে পাড়া।
হঠাৎ এসে ভাইঝি গীতা দুধের বাটি নিয়ে,
খাইয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিটে দিল ঘুম পাড়িয়ে।
বরেনবাবু ভাবেন, খোকার কেমনতর ধারা,
আধ ঘণ্টার চেঁচামেচি পাঁচমিনিটেই সারা?
বরেনবাবুর কাছে আরো বিরাট একটি ধাঁধা,
হল্‌দে চালের রঙ কেন হয় ভাত হলে পর সাদা?
পাথর বাটির গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয় তা জানি,
পাহাড় দেশে গরম কেন এমন ছট্‌ফটানি!
পথ চলতে ভেবে এসব ভিজে ওঠেন ঘামে,
মাণিকতলা যেতে চাপেন ধর্মতলার ট্রামে।
বরেনবাবু জানেন কিন্তু নানা রকম বিজ্ঞান,
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি তাই তো এমন দিক্‌-জ্ঞান॥

অখিল মাঝি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অজয়ের বুকে সারাদিন
সারাদিন তরী বাহে।
সন্ধ্যাবেলায় আঙিনায়
জাল বোনে আর গাহে,
"সুখে আছি আমি হরি হে,
অভাবেরে আমি ডরিনে,
আমায় হিংসা করেনাক কেউ,
কাহারো হিংসা করিনে।"

চাঁদ উঠে দেখে আগে যে,
সম্ভাষে আগে রবি।
কোকিলের গানে জাগে সে,
গভীর শান্তি লভি'।
ধরে পাড়ি আর গাহে গান
"ধারিনে কাহারো হরি'নে,
কাহারো মন্দে থাকিনাক আমি,
কাহারো হিংসা করিনে।"

যবে মন্দিরে বাজে শাঁখ,
সাঁজের আঁধার জমে,
দাঁড় থামায়ে সে ক্ষণকাল
হরির চরণে নমে।
শরীরে তাহার নাহি রোগ,
দেহে লাগে বটে কাদা,
বন-টগরের মত তার
হৃদিখানি রয় সাদা।

একদা গাঁয়ের জমিদার
ক'ন তরী হ'তে নামি'
"দুনিয়ার মাঝে একা তোর
হিংসা করি রে আমি।
জমিদারি দিয়ে ডিঙিখান
নিতে আছি রাজী,
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ
পাই যদি ওরে মাঝি।"

কাঙালিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়ায়ে কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
তাই আজি বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনকতপন।

কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চনরতন।

কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি—
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।

হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।

মা'র মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!

চেয়ে যেন মার মুখ-পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, 'মাগো, এ কেমন ধারা।

এত বাঁশি এত হাসিরাশি,
এত তোর রতনভূষণ—
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন!'

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই।
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে,
'আমি তো ওদের কেহ নই।

স্নেহ করে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।'
আপনার ভাই নেই বলে
ওরে, কিরে ডাকিবে না কেহ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে—
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি।
দুয়ারেতে সজল নয়ন,
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি।

আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার—
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।

শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ—
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।

দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস
তবে মিছে সহকারশাখা,
তবে মিছে মঙ্গলকলস!

আমার জন্মভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন-ধান্য-পুষ্পভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—
সকল দেশের সেরা ;

ও-সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-দেশ,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা,
কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ
এমন কালো মেঘে !
তা'র পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি,
পাখীর ডাকে জেগে !

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র
আকাশ তলে মেশে !

এমন, ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে!

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি
পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে!

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ওমা, তোমার চরণ দুটি
বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

খেয়া-ডিঙি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পাটের খেতের ভিতর দিয়া ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা-ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো,—ক্ষেতে আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান
ডুবল কত বাঁচল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম-মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার-ওপার এক্সা ক'রে দিয়ে ;
লগির গোড়া পায়না তলা, মিলে না আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে ওঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টলমলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ।

বাঁধনহারা বানের মুখে বিধি-বিধান নই—
সীমাবিহীন সাঁতার খেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে ক'ষে কাস্তে চালায় চাষী
ধানের শিষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি'।
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আঁটি-বাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালা-বাঁধা পাটের গাদা বোঝাই ক'রে মরি,
দিনে-রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে আপন মনে খেয়ার হিসাব গুণি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূয্যি উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারো মাসে একটি দিনও ছুটি কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

টবের গাছ

কালিদাস রায়

বন্দী আমি বারান্দাতে টবের চারা গাছ,
খাঁচায় পোষা ময়না পাখী, চৌবাচ্চায় মাছ।
উজল রবিচন্দ্র করে নাই নীলাকাশ মাথার 'পরে
পাই না শিশির পাই না হাওয়া পাই না আলোর আঁচ।

মায়ের বুকে স্তন্য-রসের অধিকারীই নই,
মাতৃহারা শিশুর মত দাইয়ের বুকেই রই।
বোতল ভরা দুধের মত ঝারির বারি পাই যা' যত
হায়রে তাতে মায়ের দুধের তৃষ্ণা মিটে কই?

আহা যদি ঐ মাটিতে নীল আকাশের তলে,
একটুখানি জায়গা পেতাম তরুলতার দলে,
সবার সাথে অশেষ আশায় আলো হাওয়ার ভালবাসায়
ফনফনিয়ে বেড়ে হতাম শোভন ফুলে ফলে।

আহা যদি ঐ কাননে একটু পেতাম ঠাঁই—
ঘনশ্যামল হর্ষে যেথা দুলছে সকল ভাই—
শাখায় শাখায় গলাগলি মনের কথা বলাবলি
কতই হতো, ভাবতে গেলে পুলকে চমকাই।

বনের পাখী শাখায় বসে' গাইত কতই গান,
কুলায় রচি করত মুখর আমার শ্যামল প্রাণ।
হয়ত কোন, লতা মোরে জড়াইত বাহুর ডোরে,
মৌমাছিরা করত শাখায় মৌচাকও নির্মাণ।

জানি আমি, করকাঘাত, গ্রীষ্ম দাহ খর,
শ্রাবণ ধারা সহ্য করা কঠিন বটে বড়।
জানি আমি ঝড়ের দাগে শাখাও ভাঙে পরাণ কাঁপে
তবু সকল দুখেও স্বাধীন জীবন প্রিয়তর।

ছিঁড়ত পাতা, ভাঙ্‌ত শাখা, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
দপ্ দপিয়ে ছুটত শোণিত আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
ভেঙে চুরে দ্বিগুণ জোরে অটুট জীবন উঠ্‌ত গড়ে'
ডুবত সকল ক্ষয় বা ক্ষতি, প্রচণ্ড উল্লাসে।

স্বপ্ন সবি, ও সব কথা বলে' কি আর হবে?
বামন-জীবন বইতে হবে গণ্ডী ঘেরা টবে.
বাধা পেয়ে শিকড় যথা ফিরে এসে জানায় ব্যথা ;
জানি না এই টবের জীবন শেষ হবে বা কবে?

তবু আমায় হাস্‌তে হবে নেইক পরিত্রাণ,
উৎসবে হায় করতে হবে আনন্দেরি ভাণ.
বুকের রুধির নিঙড়ে হেসে ফুল ফোটাতেও হবে শেষে,
সব দণ্ডের চেয়ে ইহাই কাতর করে প্রাণ।

ধান্যক্ষেত্র

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১)

হেমন্তে এই পল্লীমাঠে আয় গো,
দেখ্ গোধূলি কি সোনা ছড়ায় গো।
যায় যতদূর দৃষ্টিসীমা,
নত শীষের মাধুরিমা,
মিশে গেছে আকাশ-মোহানায় গো।

(২)

গ্রামগুলি সব দ্বীপের মতো ভাসছে।
সোনার সাগর থেকে সে ঢেউ আসছে।
এর চেয়ে কোন্ তীর্থনগর
বড়, এ যে গঙ্গাসাগর,
এখান থেকেই স্বর্গ দেখা যায় গো।

(৩)

শোভার লাগি' বৃথাই ঘুরিস্ বিশ্ব,
দ্বারেই যে তোর দেখার মতো দৃশ্য।
পুণ্য মোদের অগ্রহায়ণ
আনে অমন রূপনারায়ণ,
এ সোনা নাই সুবর্ণরেখায় গো।

(৪)

বক্ষে আনে তৃপ্তি আশা স্ফূর্তি
অন্নপূর্ণার এই বালিকা-মূর্তি।
বিশ্রাম আর শ্রম যে দুয়ে
আলাপ করে ধানের ভূঁয়ে
ভোগের আসন বিছায় গো।

(৫)

কি অপরূপ হেমন্তের এই সন্ধ্যা!
নাই ফুটিল শিউলি নিশিগন্ধা।
হেন কনকচূড়ের খনি,
অপূর্ব যোগ—চূড়ামণি,
ধরার গায়ে অমৃত গড়ায় গো॥

অপূর্ব-ত্যাগ

রমণীমোহন ঘোষ

রঘুনাথ পণ্ডিতের ছিল মনে মনে বড় অভিমান।
ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ, নাহি নদীয়ায় তাঁহার সমান।
পরিপূর্ণা ভাগীরথীতীরে রঘুনাথ একদা প্রভাতে,
মিলিলেন গৌরকান্তি সতীর্থ তাঁহার নিমায়ের সাথে।

এক খেয়াতরী 'পরে বসি দুইজনে করে আলোচনা—
অতীত দিনের স্মৃতি, যৌবনের নব আদর্শ সাধনা।
নিমায়ের হাতে হেরি পুঁথি একখানি তুলি লয় তায়,
পড়িতে লাগিলা রঘু, মুখখানি ছেয়ে গেল কালিমায়।

নিমাই কহিলা,—"বন্ধু, সহসা তোমার কেন এ বিষাদ।"
রঘুনাথ কহে,—"আজি উন্মূলিত মোর জীবনের সাধ!
ন্যায়ের নূতন ভাষ্য করিয়া রচনা ভাবিয়াছি মনে,
আমার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চিরদিন তরে রহিবে ভুবনে।
হা অদৃষ্ট দেখিতেছি কত তুচ্ছ মোর রচিত সে টীকা।
তোমার ভাষ্যের কাছে সূর্যালোক পাশে যেন দীপশিখা।"

"এরি লাগি এত দুঃখ, জীবনে ধিক্কার?"—কহিলা নিমাই।
"তুমি যে লিখেছ গ্রন্থ রহিবে ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য তাই।"
এত বলি পুঁথিখানি ছিঁড়ি নদীজলে দিলা বিসর্জন।
বিস্ময়ে অবাক রঘু চেয়ে দেখে তাঁর সহাস্য আনন।

নকল গড়

(রাজস্থান)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"জলস্পর্শ করব না আর"
চিতোর-রাণার পণ,
"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।"
"কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক'রে সাধবে তা আজ"
কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।"
বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন-তিনেক দূর
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে হানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
তাহার সদ্য প্রমাণ রাণা
পেয়েছেন প্রচুর।

“দূরে রহ” কহে কুম্ভ—
গর্জে যেন বাজ।
“বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।”
কহে কুম্ভ “দূরে রহ,
রাণা মহারাজ!”
ভূমির ’পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে—
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি-’পর,
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন-তিনেক দূর।
মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
"আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী!"
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।
কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
হারাবংশী বীর—
হরিণ মেরে আসছে ফিরে,
স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে, "কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির।
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।"
মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রাণা মহারাজ।

ছেলের দল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্‌কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাবনা যা' সে 'ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুল্‌তে জানে, মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে,
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক' দ্বিধা ওদের প্রাণে.
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব।

মার্কিনে আর জার্মানিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জেবলে শিখ্‌ছে ওরা কব্‌জাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

নবীন উদ্যম

রজনীকান্ত সেন

অন্তহীন জ্ঞান-গগনে নবীন তপন ভাতি রে।
এস এস সব বন্ধু মিলিয়া নবীন পুলকে মাতি রে॥

কর্ম অসীম, বিপুল বিশ্ব,
আমরা মলিন ক্ষুদ্র নিঃস্ব,
দীন-হীন-বন্ধু করুণা সিন্ধু
কেবল সাথী রে।

দ্বেষ-হিংসা-দূষিত চিত্ত
পদে পদে বাধা ছড়াবে নিত্য,
স্থির লক্ষ্যে যাইব চলিয়া
চরণে দলি' অরাতি রে।

সকলেরি যিনি পরম সহায়
জীবনে কখনো ভুলিব না তাঁয় ;
মঙ্গলময় স্নেহ-আশিস
লব নত শির পাতি' রে!

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

আমার ভার লাঘব করি
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

লেখক-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

জন্ম ১৮২০ ; মৃত্যু ১৮৯১। জন্মস্থান —মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম ; মৃত্যু কলিকাতায়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি। স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের ও সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দয়ারও তুলনা ছিল না, সেই জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে মার্জিত করে নূতন রূপ দেন। সেই জন্য তাঁকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। তাঁর লেখা বই—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, বেতালপঞ্চবিংশতি। শিশুদের জন্য তিনি লিখেছিলেন—বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয় ইত্যাদি।

'কুঠার ও জলদেবতা' নামে গল্পটি 'আখ্যানমঞ্জরী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

জন্ম ১৯০২। ইনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ইনি কয়েকখানি ভ্রমনকাহিনী রচনা করে' সুনাম অর্জন করেছেন। এঁর লেখা বই—গঙ্গাবতরণ, হিমালয়ের পথে পথে, কুঁয়ারী গিরিপথে, পঞ্চ কেদার।

'পদচিহ্ন' নামে রচনাটি 'গঙ্গাবতরণ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কালিদাস রায়—

জন্ম ৯ই জুলাই, ১৮৮৯ ; মৃত্যু ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৫। জন্মভূমি ও পিতৃভূমি কড়ুই, বর্ধমান। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি তাঁর কবিপ্রতিভার জন্য 'কবিশেখর' উপাধি পেয়েছেন। কবিতা ছাড়া তিনি গল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনাও লিখে থাকেন। ইনি সাহিত্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে জগত্তারিণী পদক পেয়েছেন। ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে তাঁর 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। ছোটদের জন্যও ইনি গল্পের বই লিখেছেন। এঁর কবিতার বই—পর্ণপুট, ব্রজবেণু, সন্ধ্যামণি, ঋতুমঙ্গল, আহরণী, বল্লরী, গাথাঞ্জলী, হৈমন্তী, বৈকালী, পূর্ণাহুতি ইত্যাদি।

'নামের মূল্য' গল্পটি তাঁর 'জাতকের গল্প' থেকে নেওয়া।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—

জন্ম ১লা মার্চ, ১৮৮৩ ; মৃত্যু ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭০। ইনি বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর ধারে কোগ্রামে বাস করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বাংলায় কৃতিত্বের জন্য 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' লাভ করেন। ইনি বহুদিন শিক্ষকতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে কবিপ্রতিভার জন্য 'জগত্তারিণী' পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে। এঁর কবিতার বই—উজানী, নূপুর, রজনীগন্ধ্যা, বনতুলসী, শতদল, তুণীর, বীথি, একতারা, অজয়, স্বর্ণসন্ধা। ছেলেদের জন্য গল্পের বই—হরে মাঝি, মুখোসের দোকান।

'কপোত-কপোতী' গল্পাংশ 'মুখোসের দোকান' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)—

কৃত্তিবাস ওঝা নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মকাল সঠিক জানা যায় নি। অনুমান চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি জন্মেছিলেন। তিনি মহাকবি বাল্মিকীর সংস্কৃতে লেখা রামায়ণ অবলম্বন করে বাংলায় পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করেন। তাঁর আগে অন্য কেউ বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় নি। আমরা এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে-ভাষা পাই সে ভাষা কৃত্তিবাসের আসল ভাষা নয়। গায়কের মুখে মুখে ভাষা বদলাতে বদলাতে প্রায় আধুনিক ভাষার রূপ পেয়েছে।

'শ্রীরামচন্দ্রের নবমীপূজা' কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী—

জন্ম ১৮৯৩। সরস্বতী এঁর উপাধি। বাসস্থান ফরিদপুর জেলায়। ইনি সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন। এঁর লেখা ছেলেদের জন্য অনেক বই আছে—বাংলার বীর, মেবার কাহিনী, শিখের কথা, বাংলার বিপ্লবী, ঋষি অরবিন্দ, সুন্দরবনের শিকারী, গরিলা শিকারী, বাংলার শহীদ ইত্যাদি। ইংরাজ লেখক আর. এম. ব্যালেণ্টাইনের লেখা 'দি গরিলা হান্টার্স' নামে প্রসিদ্ধ বইখানি অবলম্বন করে 'গরিলা শিকারী' বইখানি লেখা হয়েছে।

'আফ্রিকার জঙ্গলে' শীর্ষক রচনাটি 'গরিলা শিকারী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—

জন্ম ১৮৮৩ ; মৃত্যু ১৯৬১। জন্মস্থান—২৪ পরগণার হরিনাভি গ্রাম। মেট্রোপলিটন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করে অধ্যাপনার কাজ নেন ও ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নেন। তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। সরল ও সরস ভাষায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এঁর লেখা বই—নব্য বিজ্ঞান, বাঙ্গালীর খাদ্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিশ্বের উপাদান, ব্যাধির পরাজয়, পদার্থবিদ্যার নবযুগ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী, তড়িতের অভ্যুত্থান ইত্যাদি।

'তড়িৎ ও চুম্বকের আবিষ্কার' প্রবন্ধটি 'তড়িতের অভ্যুত্থান' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

জলধর সেন—

জন্ম বাংলা ১২৬৬, ১লা চৈত্র ; মৃত্যু ১৩৪৫, ২৬শে চৈত্র। বাসস্থান নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম ও পরে কলিকাতা। ইনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর ১৮৯০ সালে হিমালয় ভ্রমণে যান। পরে সাহিত্যসেবায় মন দেন। অনেক সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে

ইনি যুক্ত ছিলেন। ১৩২০ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি অনেক গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও কিশোরপাঠ্য বই লিখেছিলেন। এঁর লেখা বই—মহিলায় পথিক, দক্ষিণাপথ, পরশ পাথর, পরাণ মণ্ডল, অভাগী (১ম ও ২য়), কাঙ্গালের ঠাকুর ইত্যাদি।

'বদরীনাথ' নামে রচনাটি 'হিমালয়' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—

জন্ম ১৮৭৭। আদি বাসস্থান—ঢাকায় উলাইল কর্ণপড়া। অল্প বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে। তাঁর লেখা শিশু ও কিশোরদের বই খুব জনপ্রিয়। তিনি অনেক বই লিখেছেন। তার মধ্যে ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, চারু ও হারু বিখ্যাত। কিছুকাল পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটি তাঁর 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—

জন্ম ১৯০৬। **জন্মস্থান** বরিশাল জেলা। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহকারী কর্মসচিব ছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান 'বিজ্ঞানভারতী রচনা করে' ১৯৫৫ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহ দাস পুরস্কার' পান। 'মানবকল্যাণে' রসায়ণ গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'কিশোরবিজ্ঞানী' নামে বিজ্ঞানের বই লিখেছেন। তাঁর লেখা অন্য বই—'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র'।

'মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র' রচনাটি 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' থেকে নেওয়া হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

জন্ম ১৮৮৩ ; মৃত্যু ১৮৯৪। পিতৃভূমি কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, চব্বিশ পরগণা। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন ও ১৮৯১ সালে সেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক

বলা হয়। তিনি উপন্যাস ছাড়া অনেক প্রবন্ধের বইও রচনা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। অন্য উপন্যাস—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, সীতারাম, ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় ইত্যাদি। অন্য গ্রন্থ—কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র।

'রাধারাণী' শীর্ষক গল্পাংশ 'রাধারাণী' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—

জন্ম ১৮৯৯। জন্মস্থান—বিহারে পূর্ণিয়া জেলার মনিহারি গ্রাম। আদিবাস—হুগলী জেলার শেয়াখালা। ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাশ করেন। তাঁর পেশা ডাক্তারী, কিন্তু নেশা সাহিত্য। লেখা ও পড়াশুনা নিয়ে থাকেন। সাহিত্য জগতে 'বনফুল' নামেই সকলে তাঁকে জানে। ছোট গল্পলেখক হিসাবে তাঁর তুলনা পাওয়া শক্ত। তাঁর উপন্যাস—স্থাবর, জঙ্গম, দৈবরথ, শিকার, হাটে বাজারে ইত্যাদি। তিনি কয়েকখানি জীবনী নাট্যও রচনা করেন—শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর।

'শিক্ষক বিদ্যাসাগর' শীর্ষক নাট্যাংশটি 'বিদ্যাসাগর' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

জন্ম ১৮৯৪ ; মৃত্যু ১৯৫০। পৈতৃক বাসস্থান—বনগ্রাম মহকুমার ব্যারাকপুর। বি. এ. পাশ করে শিক্ষকতা করেন। বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর স্থান উঁচুতে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর 'ইছামতী' নামে উপন্যাসের জন্য তাঁকে বাংলা সরকার রবীন্দ্র পুরস্কার দেন। তাঁর গ্রন্থ—পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টি, প্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, অনুবর্তন, দেবযান, ইছামতী ইত্যাদি।

'অপুর পাঠশালা' 'পথের পাঁচালী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—

জন্ম ১৮৭৮ ; মৃত্যু ১৯৪৮। পিতৃভূমি নদীয়া জেলার জমসেরপুর। তিনি সারাজীবন কাব্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম—রেখা, লেখা, নাগকেশর, অপরাজিতা, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী, পাঞ্চজন্য ইত্যাদি।

'খেয়াডিঙি' কবিতাটি তাঁর 'রেখা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

রজনীকান্ত সেন—

জন্ম ১৮৬৫ ; মৃত্যু ১৯১০। জন্মভূমি পাবনা জেলার ভাঙগাবাড়ী। ইনি রাজশাহীতে ওকালতি করতেন। ইনি কবিতা ভিন্ন অনেক গানও রচনা করেছিলেন। অল্পবয়সে ক্যান্সার রোগে কলিকাতায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এঁর লেখা কবিতার বই—বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, অভয়া, অমৃত, সদ্ভাবকুসুম ও বিশ্রাম।

রমণীমোহন ঘোষ—

জন্ম ১৮৭৭ ; মৃত্যু ১৯২৭। পিতৃভূমি ঢাকা জেলা। ইনি ডাক-বিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এঁর লেখা কবিতার বই—মুকুর, মঞ্জরী, দীপশিখা, ঊর্মিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

জন্ম ১৮৬১ ; মৃত্যু ১৯৪১। জন্মস্থান কলিকাতা জোড়াসাঁকো। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। কাব্য-সঙ্গীত-নাটক- গীতিনাট্য-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও কিশোরের জন্য রচনা—সাহিত্যের সকল বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন ও সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর' উপাধি দেন ও ভারত সরকার 'নাইট' (স্যার) উপাধি দেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগে

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেই উপাধি তিনি পরিত্যাগ করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্বভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেইটি এখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা অনেক। এখানে কতকগুলি নাম দেওয়া হইল। কবিতা—সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, কল্পনা, চিত্রা, খেয়া, বলাকা, পত্রপুট, মহুয়া, জন্মদিনে, আরোগ্য ; উপন্যাস—চোখের বালি, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, গোরা, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ ; নাটক—রাজা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, বাঁশরী, প্রজাপতির নির্বন্ধ, শেষরক্ষা, চিরকুমার সভা ; ভ্রমণ—রাশিয়ার চিঠি, জাপানযাত্রি, যাত্রী ; প্রবন্ধ—প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, শান্তিনিকেতন, পঞ্চভূত।

রাজশেখর বসু—

জন্ম ১৮৮০ ; মৃত্যু ১৯৬০। পিতৃভূমি নদীয়া জেলার উলাবীরনগর। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। তারপর তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন। হাসির গল্পরচনায় তাঁর তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'পরশুরাম'। তাঁর হাসির গল্পের বই—গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি। হাসির গল্প ছাড়া তিনি লিখেছিলেন 'চলন্তিকা' (অভিধান), লঘুগুরু, কুটিরশিল্প, কালিদাসের মেঘদূত, ভারতের খনিজ, বাল্মীকি রামায়ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাভারত, হিতোপদেশের গল্প। এগুলি তাঁর নিজের নামে প্রকাশিত।

'মুনি আর ইঁদুরের গল্প' তাঁর হিতোপদেশের গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীলীলা মজুমদার—

জন্ম ১৯০৮। ইনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে বি. এ-তে ইংরাজী অনার্সে এবং ১৯৩০ সালে

ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন অধ্যাপনার কাজ করেন ও পরে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁর লেখা বড়দের জন্য বই—শ্রীমতী, ঝাঁপতাল, চীনে লণ্ঠণ, মণিমালা, মনিকুন্তলা, জোনাকি ইত্যাদি। ছোটদের বই—দিন দুপুরে, পদিপিসির বর্মীবাক্স, হলদে পাখীর পালক ইত্যাদি। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন।

'দিন দুপুরে' গল্পাংশ তাঁর 'দিন দুপুরে' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

জন্ম ১৮৭৬ ; মৃত্যু ১৯৩৮। জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকরী করেছিলেন। তিনি বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। তাঁর অপূর্ব লেখার জন্য তাঁহাকে অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হত। তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির নাম—শ্রীকান্ত (১ম—৪র্থ), দেবদাস, বড়দিদি, পল্লী-সমাজ, ষোড়শী, দত্তা, মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, অরক্ষণীয়া, বিপ্রদাস, চরিত্রহীন, শেষ প্রশ্ন, পথের দাবী, বিরাজ বৌ, পরিণীতা ইত্যাদি।

'রামের সুমতি' শীর্ষক গল্পাংশ শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

জন্ম ১৮৮২ ; মৃত্যু ১৯২২ ; পিতৃভূমি চুপী, বর্ধমান। জন্মস্থান কলিকাতা। এঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। ইনি বাংলা কবিতায় অনেক রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। সেই জন্য এঁকে ছন্দের যাদুকর বলা হয়। এঁর লেখা কবিতার বই—হোমশিখা, কুহু ও কেকা, অভ্র, আবীর, তুলির লিখন, মণিমঞ্জুষা, বিদায়, আরতি, তীর্থরেণু, তীর্থসলিল, ফুলের ফসল ইত্যাদি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য—

জন্ম ১৯২৬ ; মৃত্যু ১৯৪৭। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতৃভূমি মাদারিপুর, ফরিদপুর। মাত্র বিশ বছর ইনি বেঁচেছিলেন কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি কবিপ্রতিভার অসামান্য পরিচয় দিয়েছেন। এঁর গ্রন্থ—ছাড়পত্র, পূর্বাভাষ।

সুকুমার রায়—

জন্ম ১৮৮৭ ; মৃত্যু ; ১৯২৩। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শিশু ও কিশোরদের জন্য কবিতা ও গল্প রচনায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁর লেখা কবিতার বই—আবোল-তাবোল, খাই খাই ; গল্পের বই—হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী ইত্যাদি।

'ছাগলে কিনা খায়' গল্পাংশটি হ-য-ব-র-ল থেকে নেওয়া হয়েছে।

সুনির্মল বসু—

জন্ম ১৯০২ ; মৃত্যু ১৯৫৭। জন্মস্থান গিরিডি (বিহার)। পিতৃভূমি ঢাকা জেলার মালকানগর। শিশু ও কিশোরদের জন্য কবিতা ও গল্প রচনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। একশ'র বেশী বই ইনি লিখেছেন। এঁর লেখা বই—হাওয়ার দোলা, বীর শিকারী, বন্দীবীর, কানাকড়ির খাতা, আমার ছড়া ইত্যাদি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার—

জন্ম ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০৭। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজীতে বি. এ. ও এম. এ.। শান্তিনিকেতন কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে বিনয় ভবন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ। বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক। এঁর লেখা বই—কালোর বই, সাতমহল (কাব্য), রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা, শিক্ষায় মত পথ, কথা কও (নাটক) ইত্যাদি।

'বাঘা' গল্পটি তাঁর 'কালোর বই' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থে যে গদ্যাংশ ও কবিতাগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে—

শ্রীপ্রতীপচন্দ্র বসু—রাজশেখর বসুর লেখা 'হিতোপদেশে'র গল্প থেকে নেওয়া "মুনি আর ইঁদুর" গল্পের জন্য ;

শ্রীসত্যজিৎ রায়—সুকুমার রায়ের লেখা 'হ-য-ব-র-ল থেকে নেওয়া "ছাগলে কিনা খায়" গল্পাংশের জন্য ;

শ্রীলীলা মজুমদার—তাঁর লেখা "দিন দুপুরে" গল্পাংশের জন্য ;

কালিদাস রায়—তাঁর লেখা 'জাতকের গল্প' থেকে নেওয়া "নামের মূল্য" গল্পাংশ ও "টবের গাছ" কবিতার জন্য ;

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—তাঁর লেখা 'বিদ্যাসাগর' নাটক থেকে নেওয়া "শিক্ষক বিদ্যাসাগর" নাট্যাংশের জন্য ;

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—তাঁর লেখা "মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র" গদ্যাংশের জন্য ;

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—তাঁর লেখা 'গঙ্গাবতরণ' থেকে নেওয়া "পদচিহ্ন" গদ্যাংশের জন্য ;

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—তাঁর লেখা 'মুখোসের দোকান' গ্রন্থ থেকে নেওয়া "কপোত-কপোতী" গল্পাংশ এবং "অখিল মাঝি" এবং "ধান্যক্ষেত্র" কবিতার জন্য ;

শ্রীআশিসকুমার বসু—সুনির্মল বসুর লেখা "আলোর বাণী" কবিতার জন্য ;

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য—সুকান্ত ভট্টাচার্যের "জ্ঞানী" কবিতার জন্য ;

বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছেলেবেলা" গদ্যাংশ, "প্রার্থনা", "কাঙালিনী" ও "নকল গড়" কবিতার জন্য ;

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "রামের সুমতি" গল্পাংশের জন্য ;

শ্রীঅমলচন্দ্র ভট্টাচার্য—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের "তড়িৎ ও চুম্বক" গদ্যাংশের জন্য।

নিম্নলিখিত রচনাগুলির সম্বন্ধে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে না জানায় আমাদের পক্ষে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয় নি। আমরা তাঁদের অনুমতি নিতে ইচ্ছুক রইলাম—

সাত ভাই চম্পা	ঃ	দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
আফ্রিকার জঙ্গলে	ঃ	চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী
খেয়া-ডিঙি	ঃ	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
অপূর্ব-ত্যাগ	ঃ	রমণীমোহন ঘোষ
ছেলের দল	ঃ	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত